৬

উপমহাদেশে মুসলিম অভিযান

অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে তিন পর্যায়ে মুসলিম আক্রমণ এই ইউনিটের প্রতিপাদ্য বিষয়।

অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের সিন্ধু বিজয় মুসলিম আক্রমণের প্রথম পর্যায়। এই বিজয় ক্ষণস্থায়ী ছিল, কিন্তু এর সুদূর প্রসারী ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে প্রথম পাঠে।

একাদশ শতাব্দীতে গজনীর সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান মুসলিম আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়।এই আক্রমণের উদ্দেশ্য, ঘটনাবলি ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে দ্বিতীয় পাঠে।

তৃতীয় পাঠে স্থান পেয়েছে মুসলিম অভিযানের তৃতীয় পর্যায়- মুহাম্মদ ঘোরীর আক্রমণ। এই আক্রমণ ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিল।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. আরবদের সিন্ধু বিজয়
- পাঠ-২. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান
- পাঠ-৩. মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান

পাঠ - ১

আরবদের সিন্ধু বিজয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন ;
- আরবদের স্থায়ী শাসুন প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা করতে পারবেন ;
- আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই ভারতের সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ ছিল। এ যোগাযোগ ছিল বাণিজ্যিক। আরব বণিকরা ভারতের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে এসে এদেশের পণ্যদ্রব্য নিজ দেশে এবং মধ্য-এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপে পাঠাতো। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রচারের পর আরব মুসলমানরাও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। তারাও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভারতে আসতে থাকে। তাঁরা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গেও বাণিজ্য করতো। আরব বণিকরা প্রধানত: পাকিস্তানের উপকূলবর্তী মাকরান এবং সিংহল, মাদ্রাজ উপকূল ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী বন্দরগুলোতে আসতো।

ভারত আক্রমণকারী মুসলমানদের মধ্যে আরবরাই প্রথম ভারতে এসেছিল। মহানবীর (দ:) মৃত্যুর কুড়ি বছরের মধ্যেই তারা সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর এবং পারস্য জয় করে। এরপর তারা পূর্বদিকে আরো অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করতে থাকে। ভারত-প্রত্যাগত ব্যবসায়ীদের কাছে ভারতের বিশাল সম্পদের কথা শুনে তারা ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হজরত ওমরের (রাঃ) শাসনামলে ৬৩৬-৬৩৭ সালে মুসলমানরা প্রথম ভারতে অভিযান করে।কিন্তু এ ধরনের অভিযান অত্যন্ত বিপজ্জনক বিবেচিত হওয়ায় তা পরবর্তীকালে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

হযরত ওমরের (রাঃ) উত্তরাধিকারীগণ পরবর্তীকালে আবার ভারতে অভিযান পাঠাতে শুরু করেন। ৬৪৩-৬৪৪ সালে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন রাবির নেতৃত্বে মুসলমানরা কিরমান আক্রমণ করে। তিনি সিজিস্তান পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং সেখানকার শাসনকর্তা প্রচুর অর্থ দিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এরপর তিনি মাকরান আক্রমণ করেন। মাকরান ও সিন্ধুর রাজা যৌথভাবে বাধা দিয়েও মুসলমানদের কাছে পরাজিত হন। মুসলমান সেনাপতি এই বিজয়ের ধারাবাহিকতায় আরো অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু খলিফার সাবধানী নীতির ফলে তা সম্ভব হয়নি।

উমাইয়া খলিফাদের আমলে মুসলমানদের সাম্রাজ্য আরো পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করে। ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামলে তাঁর উৎসাহে আরবরা সিন্ধু আক্রমণ করেন।

সিন্ধু বিজয়ের কারণ

আরবদের সিন্ধু অভিযানের বহু কারণ ছিল।উমাইয়া শাসনামলে মুসলমানরা রাজ্যজয়ে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠে। উমাইয়া খলিফারা ছিলেন সম্প্রসারণবাদী। কাজেই মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তারের অংশ হিসেবে এ সময় ভারতে অভিযান পরিচালিত হয়।

এ সময় খলিফা প্রথম ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এবং পূর্বদিকে মুসলমান সাম্রাজ্যের বিস্তারে প্রচন্ড আগ্রহী। এ সময় মুসলমানরা বোখারা, সমরকন্দ এবং ফারগানা জয় করে। কাশগড়ের বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরিত হয় এবং সেখানকার চৈনিক শাসক মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। কাবুলের রাজার বিরুদ্ধেও সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সিন্ধুতেও মুসলমানরা অভিযান করেছিল।

মুসলমানদের পারস্য অভিযানের সময় কিছু কিছু ভারতীয় রাজা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারস্যকে সাহায্য করেছিল। এর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যেও আরবরা সিন্ধু আক্রমণ করেছিল।

হাজ্জাজের কঠোর শাসনে কিছু আরব বিদ্রোহ করে এবং তারা সিন্ধুতে আশ্রয় গ্রহণ করে। হাজ্জাজ তাদের ফেরৎ চাইলে সিন্ধুর রাজা দাহির তাদের ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। ফলে হাজ্জাজ রাগান্বিত হয়ে সিন্ধু আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ভারতের অতুল ঐশ্বর্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাঁর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আরবদের সিন্ধু আক্রমণের আগে ও পরে বহু বিদেশী শক্তিই ভারতের ধন-সম্পদের লোভে এদেশ আক্রমণ করেছিল। আরবরা ছিল তুলনামূলকভাবে দরিদ্র। কাজেই ভারতের ধন-সম্পদ দিয়ে নিজেদের দারিদ্র্য মোচনও ছিল আরবদের সিন্ধু অভিযানের অন্যতম কারণ।

সিন্ধু উপকূলে জলদস্যু কর্তৃক আরবদের জাহাজ লুণ্ঠন ছিল আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ। সিংহলে বাণিজ্যরত কয়েকজন আরব বণিকের মৃত্যু হলে সিংহলের রাজা মৃত বণিকদের আত্মীয়-স্বজনদের এবং হাজ্জাজের জন্য প্রচুর উপহার জাহাজযোগে পাঠান। দেশে ফেরার পথে এ জাহাজগুলো ঝড়ের কারণে সিন্ধুর দেবল বন্দরে আশ্রয় নেয় এবং জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। জলদস্যুরা হাজ্জাজের জন্য প্রেরিত উপহার সামগ্রী লুট করে এবং মৃত বণিকদের বিধবা স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনদের বন্দি করে। এ খবর পেয়ে হাজ্জাজ সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেন। হাজ্জাজ এতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিন্ধুর বিরুদ্ধে হাজ্জাজের প্রেরিত প্রথম দুটি অভিযান ব্যর্থ হয় এবং দুজন সেনাপতিই নিহত হন। এতে হাজ্জাজ সিন্ধু অভিযানের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম ৬০০০ অশ্বারোহী ও ৬০০০ উষ্ট্রারোহী নিয়ে সিন্ধু অভিযানে যাত্রা করেন। এই বিশাল বাহিনীর রসদ বহনের জন্য ৩০০০ উট ছিল। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কাসিম সিরাজ ও মাকরানের পথ ধরে দেবলের দিকে অগ্রসর হন। হিন্দু শাসকের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন স্থানীয় বহু জাট ও মেভ কাসিমের বাহিনীতে যোগদান করেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে কাসিম দেবলে উপস্থিত হন। হাজ্জাজ দুর্গ অবরোধ করার জন্য বিরাট আকারের 'মনজানিক' (প্রস্তর-নিক্ষেপক) সমুদ্রপথে প্রেরণ করেন। দেবলেও বহু স্থানীয় অধিবাসী কাসিমের বাহিনীতে যোগদান করে। প্রচন্ড যুদ্ধের পর হিন্দুরা পরাজিত হয়। মুসলমান সৈন্যরা লুট-তরাজ শুরু করে এবং অবরুদ্ধ হিন্দু সৈন্যদের হত্যা করে। দুর্গাধিপতি পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম মুসলমানদের জন্য থাকার জায়গা ঠিক করে দেন। তিনি একটি মসজিদও তৈরি করেন এবং দুর্গের শাসন পরিচালনার জন্য ১০০০ সৈন্য রেখে যান।

দেবল অধিকারের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম নিরুণ অভিমুখে অগ্রসর হন। নিরুণের অধিবাসীরা মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং অর্থের বিনিময়ে নিজেদের মুক্তির ব্যবস্থা করে। এরপর কাসিম সেহওয়ান জয় করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম এরপর নৌকা দিয়ে সেতু তৈরি করে সিন্ধু নদ পার হয়ে রাওয়ারে দাহিরের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হন। উভয় পক্ষই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিন্তু আরব সেনাপতির দক্ষতা ও আরব ধনুর্বিদদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে দাহিরের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়। দাহির যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। দাহিরের মৃত্যুর পর তাঁর সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় দাহিরের স্ত্রী রানীবাঈ রাওয়ারের দুর্গে আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয় এবং রাণী ও দুর্গের অন্যান্য মহিলা জওহর ব্রত পালন করেন। রাওয়ার দুর্গ মুসলমানদের দখলে আসে। এরপর মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রায় বিনা যুদ্ধেই ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করেন। মুহাম্মদ বিন

কাসিম এর পর থেকে একে দাহিরের রাজধানী আড়র এবং মুলতান দখল করেন। এরপর মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর এক সেনাপতিকে কনৌজে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই অভিযান শুরু হওয়ার আগেই তিনি তাঁর নিজের প্রত্যাবর্তনের আদেশ লাভ করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু সম্পর্কে বিতর্কিত তথ্যাদি পাওয়া যায়। একটি উৎসানুসারে দাহিরের মৃত্যুর পর তাঁর দুই কন্যাকে খলিফার কাছে পাঠানো হয়। তাঁরা খলিফার কাছে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিরুদ্ধে তাঁদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ করলে খলিফা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে কাঁচা চামড়ার থলিতে ঢুকিয়ে তাঁর কাছে পাঠাবার নির্দেশ দেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম নিজেই কাঁচা চামড়ার থলিতে ঢুকেন এবং দুএকদিনের মধ্যেই মারা যান। চামড়ার থলি খলিফার কাছে পৌঁছালে দাহিরের কন্যারা তাঁদের মিথ্যা অভিযোগের কথা স্বীকার করে। ক্রুদ্ধ খলিফা দাহিরের দুই মেয়েকে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে মারা না যাওয়া পর্যন্ত তাদের রাস্তায় রাস্তায় টানার আদেশ দেন। অনেকের মতে এটা একটা বানানো বাহিনী, তবে মুহাম্মদ বিন কাসিমের শেষ জীবন যে অত্যন্ড় বেদনাদায়ক ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্য একটি উৎসানুসারে বন্দি করে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে খলিফার কাছে পাঠানোর পরে খলিফার আদেশে অত্যাচার করে তাঁকে মারা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন কাসিমের বেদনাদায়ক শেষ পরিণতির জন্য দামেস্কে উমাইয়া খলিফার পরিবর্তন এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বংশের প্রতি নতুন খলিফার নিষ্ঠুর নীতিকে দায়ী করেন। খলিফা ওয়ালিদের আমলে সিন্ধু বিজিত হয় এবং তখন হাজ্জাজের ছিল প্রবল প্রতিপত্তি। কিন্তু পরবর্তী খলিফা সোলায়মান ছিলেন হাজ্জাজের শত্রু। ইতোমধ্যে হাজ্জাজের মৃত্যু হলে খলিফার রোষ পড়ে তাঁর বংশধর মুহাম্মদ বিন কাসিমের ওপর এবং এ কারণেই মুহাম্মদ বিন কাসিমের এ করুণ পরিণতি ঘটে।

মাত্র তিন বছরের মধ্যে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করে সেখানে খলিফার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সাফল্যের কারণ

সিন্ধু বিজয়ে আরবদের সাফল্যের অনেকগুলো কারণ ছিল।

সিন্ধুবাসীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাফল্যের একটি কারণ। দাহিরের নিজের পরিবারেও কোন ঐক্য ছিল না যার ফলে কোনো সংঘবদ্ধ বা সমন্বিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা ছিল দুষ্কর।

সিন্ধুর রাজা দাহির মোটেও জনপ্রিয় ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যাচারী যার ফলে তিনি প্রজাদের সর্ব্বাত্মক সহযোগিতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

সিন্ধুবাসীর ধর্মীয় বিভেদও আরবদের সাফল্যে অবদান রেখেছিল। বর্ণবিভক্ত হিন্দু সমাজে সাম্যের কোন স্থান ছিল না, বরং ছিল এক বর্ণের প্রতি অন্য বর্ণের বিরূপ মনোভাব। তাছাড়া, এ বর্ণ বিভক্ত সমাজে শুধুমাত্র ক্ষত্রিয়রাই যুদ্ধ করতে পারতো যার ফলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আরবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি। বর্ণ-বিভক্ত এ সমাজে সামাজিক বৈষম্যও ছিল প্রকট। বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ছিল উৎপীড়িত ও অবহেলিত। তাদের জন্য ঘোড়ায় চড়া, মিহিবস্ত্র পরিধান করা ইত্যাদি ছিল নিষিদ্ধ। এসব কারণে তারা শুধুমাত্র এক শ্রমজীবী শ্রেণী হিসাবেই বিবেচিত হতো যা প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। এ শ্রেণীর বহু মানুষ স্বেচ্ছায় আরব বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল যা আরবদের সাফল্যের একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আরবদের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল আরব সেনাপতির নৈপুণ্য এবং আরবদের উন্নত সামরিক পদ্ধতি। আরব সৈন্যবাহিনী ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দেশ জয়ের উৎসাহ ও শক্তি তাদের সাফল্য অর্জনে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে সিন্ধুরাজের সৈন্যবাহিনী আকারে বিশাল হলেও শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ বা সাজ-সরঞ্জামে ছিল আরব বাহিনীর তুলনায় হীনতর।

সিন্ধু বিজয়ের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম সেখানে একটি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। বিজিত জনগণের প্রতি তাঁর নীতি ছিল বুদ্ধিমত্তা ও সহিষ্ণুতামন্ডিত। অবাধ্যদের প্রতি নিষ্ঠুর হলেও বশ্যতা স্বীকার করার পর

তিনি কখনও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেননি। যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের তিনি দাসত্ব ও জিজিয়া কর প্রদান থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অমুসলমানদের কাছ থেকে তিনি কর আদায় করে তাদের জমি ও সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার দিয়েছিলেন। রাজস্ব আদায়কারীদের কৃষকদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার আদেশ দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয় এবং তাদের প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করা হয়। সকলকেই ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল। হাজ্জাজ মুহাম্মদ বিন কাসিমকে একটি চিঠিতে এদেশীয়দের জানমালের ওপর হস্তক্ষেপ না করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সকলকেই তাদের নিজ নিজ ধর্মপালনের স্বাধীনতা দেওয়ার নির্দেশও সে চিঠিতে ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর বিধর্মীদের মন্দির মেরামত করার অনুমতিও দিয়েছিলেন।

প্রয়োজনের তাগিদেই প্রশাসনিক কাজে এদেশীয়দের নিযুক্ত করা হয়েছিল। আগে থেকেই ব্রাহ্মণরা যে সব পদে নিযুক্ত ছিল মুহাম্মদ বিন কাসিম তাদের সে সব পদে বহাল রাখেন। বিজিত রাজ্যগুলোকে তিনি কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক জেলায় একজন সামরিক কর্মচারীকে শাসন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সরকারি কর্মচারীদের তাদের কাজের পরিবর্তে জায়গীর হিসেবে জমি দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নগদ অর্থেও বেতন দেয়া হতো। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মশাস্ত্রবিদদের সরকারি জমি ভোগ করতে দেওয়া হতো।

রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব, যাকাত, জিজিয়া, গণিমাৎ ইত্যাদি। উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত জিজিয়া কর আদায় করা হতো। জমির খাজনা ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ থেকে দুই-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত। গণিমাৎ বা যুদ্ধে লুণ্ঠিত ধনের চার-পঞ্চমাংশ সৈন্যদের দেওয়া হতো, এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে জমা হতো। বিচারের দায়িত্ব ছিল কাজির। মুসলমান আইন অনুসারে বিচার করা হতো। হিন্দুদের ক্ষেত্রে কোনো কোনো অপরাধে অমানুষিক কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের মধ্যে পরস্পরের বিবাদের বিচার করতো হিন্দু পঞ্চায়েত।

সিন্ধু জয় করলেও আরবরা সেখানে স্থায়ীভাবে কোনো শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এর অবশ্য বেশ কয়েকটি কারণও ছিল।

প্রথমত, বিভিন্ন গোত্রের মানুষ নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেছিলেন। যুদ্ধ জয়ের উম্মাদনা শেষ হয়ে গেলে তাদের মধ্যে আগের গোত্রগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে তাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব দেখা যায় যা তাদের দুর্বল করে ফেলে। শিয়া-সুন্নি ধর্মীয় দ্বন্দ্ব তাদেরকে আরো দুর্বল করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, সিন্ধুর অনুর্বরতার কারণে আরবরা এদেশের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এমন একটা অঞ্চল অধিকারে রাখা আরবদের কাছে খুব লাভজনক মনে হয়নি।

তৃতীয়ত, আরবরা কেবলমাত্র সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চলই অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল।এর বাইরে উত্তর ও পূর্বদিকে শক্তিশালী রাজপুতদের পরাজিত করে এদেশে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করা আরবদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

চতুর্থত, মুহাম্মদ বিন কাসিমের আকস্মিক অপসারণ ও মৃত্যু এদেশে মুসলমান শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। তাঁর বিজয় অভিযান অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর এর স্থায়িত্ব খলিফাদের সহযোগিতা ও সমর্থনের অভাবে আরো স্বল্পস্থায়ী হয়ে পড়ে। এ সময় খিলাফতের শক্তিরও অবনতি ঘটে যার ফলে দূরবর্তী প্রদেশগুলোর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে। সিন্ধু কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সিন্ধুতে বসবাসকারী আরবরা বিভিন্ন এলাকায় তাদের নিজেদের বংশ প্রতিষ্ঠা করে শাসন করতে থাকে। মুলতান, মনসুরা এবং সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে এ ধরনের ছোট ছোট মুসলমান শাসিত অঞ্চল দেখা যায়। এ সমস্ত কারণে সিন্ধু বিজয়ের পর সিন্ধুতে আরব-শাসন স্থায়িত্ব লাভ করেনি।

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। ঐতিহাসিক টড তাঁর রাজস্থানের ইতিহাস গ্রন্থে আরবদের সিন্ধু বিজয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে ঐতিহাসিক স্টেনলি লেনপুল আরবদের সিন্ধু বিজয়কে ফলাফলবিহীন এক অকিঞ্চিৎকর ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন।

রাজনৈতিক ফলাফল বিচার করলে লেনপুলের মতকে অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন কারণে সিন্ধু বিজয়কে কেন্দ্র করে সেখানে বা ভারতে স্থায়ী মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি যা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যাপক এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ্ও বলেছেন যে, আরবরা ভারতে ইসলামকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরবদের সিন্ধু বিজয়কে নিষ্ফল বলা যায় না। রাজনৈতিক ফলাফলবিহীন এ বিজয়ের সামাজিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সঙ্গে আসা বহু আরব সৈনিক আর দেশে ফিরে যায়নি। স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করে তাঁরা সিন্ধুতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। ফলে বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বসতি গড়ে ওঠে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে ইসলাম হয়ে ওঠে সাম্য, মুক্তি ও অগ্রগতির প্রতীক। ফলে বহু স্থানীয় অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং মুসলমানরা জনগোষ্ঠীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। মনসুরা, মুলতান, দেবল এবং নিরুণে আরবদের বেশ ঘনবসতি ছিল এবং এসব স্থানে বড় বড় জামে মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল। এসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানদের সঙ্গে তাদের প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় ছিল। সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানদের ভাবানুভূতির দিকে লক্ষ রেখে মুসলমানরা এসব জায়গায় গরু জবেহ নিষিদ্ধ করেছিল। কালক্রমে আরবরাও এদেশীয় রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। মনসুরার আরব শাসনকর্তা হাতি টানা রথে ভ্রমণ করতেন এবং হিন্দু রাজাদের অনুকরণে কানে দুল এবং গলায় হার পরতেন। আরবদের স্থায়ীভাবে সিন্ধুতে বসবাস করার ফলে সিন্ধি ভাষায় ও সামাজিক রীতিনীতিতে আরবীয় প্রভাব দেখা যায়। এখনও সিন্ধি ভাষায় আরবি হরফ ব্যবহৃত হয় এবং সিন্ধি ভাষার ওপর আরবি ভাষার প্রভাব দেখা যায়। সিন্ধুর সমাজব্যবস্থাও অনেকাংশে আরবদের অনুকরণে উপজাতীয় ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠেছে। আরবদের উপজাতীয় প্রধানকে বলা হয় 'শেখ', সিন্ধুতে তাঁকে বলা হয় 'ওয়াদেরা'। আরবদের মত সিন্ধিরাও অতিথিবৎসল।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরবরা প্রাচীনকাল থেকেই দক্ষতা ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিল এবং ভারতের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগও ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর ভারতের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্যিক তৎপরতা এবং যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি পায়। আরব শাসনামলে সিন্ধুর কৃষি ও বাণিজ্য উন্নতি লাভ করে। আরবদের সঙ্গে ভারতের এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্য চলতো। বাণিজ্যের জন্য স্থলপথ ও জলপথ উভয়ই ব্যবহৃত হতো। সিন্ধুর হিন্দুরা বহির্বাণিজ্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।ভারতীয় রাজারা নিজেদের বাণিজ্যিক উন্নতির আশায় আগের মতই এখন আরব মুসলমান বণিকদের স্বাগত জানায় এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখে।

ধর্মের ক্ষেত্রেও সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল লক্ষ করা যায়। স্থায়ীভাবে বসবাস ও স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করার ফলে সিন্ধুতে ক্রমে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু স্থানীয় অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল দেখা যায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। মুসলমান সংস্কৃতি ভারতীয়দের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। আরবরা এদেশে এসে এখানকার উঁচু মানের সভ্যতা দেখে বিস্মিত হয়েছিল। আরবরা ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, দার্শনিক, পন্ডিত ও কারিগরদের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। তাবারির বিবরণ থেকে জানা যায় যে অসুস্থ হয়ে পড়লে খলিফা হারুন-উর-রশিদ ভারত থেকে একজন চিকিৎসক নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর চিকিৎসাতেই খলিফা আরোগ্য লাভ করেছিলেন। ভারতীয় বহু চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রন্থও আরবি ভাষায় অনুদিত হয়। এগুলোর মধ্যে শশ্রু ও চরকের

গ্রন্থ দুটি আরবে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পশু-চিকিৎসা এবং সর্পদংশন চিকিৎসা সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থও আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, আরবরা ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

শাসনব্যবস্থায়ও আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকে বহু কিছু শিখেছিল। তাদের প্রশাসনিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার কারণেই মুহাম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণদের শাসনকাজে ব্যাপকভাবে নিয়োগ করেছিলেন। আরবীয় সংস্কৃতির বহু কিছুই পরবর্তীকালে ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এগুলোর অধিকাংশই আরবরা প্রথমে ভারতীয়দের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল। আরবরা দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদির জ্ঞান ভারতীয় পন্ডিতদের কাছ থেকেই পেয়েছিল। আব্বাসীয় খলিফারা ভারতীয় পন্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। খলিফা মনসুরের শাসনামলে ভারতীয় পন্ডিতগণ বাগদাদে গিয়েছিলেন। ভারতীয় পন্ডিতদের সহায়তায় আল-ফাজরী ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত এবং খাদ্যক নামে দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এ দুটি ছিল জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ। আল-বেরুনীর মতে ভারতীয়দের কাছ থেকেই আরবরা প্রথম জ্যোতির্বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করেছিল। গাণিতিক সংখ্যা সম্পর্কে জ্ঞানও আরবরা হিন্দুদের কাছ থেকে লাভ করেছিল, সে কারণে আরবরা সংখ্যাকে বলে 'হিন্দসাস'। আব্বাসীয় খলিফা হারুন-উর-রশিদের সময়ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। তাঁর মন্ত্রী ইয়াহিয়া বারমকী ও তাঁর দুই পুত্র মুসা ও আমরান বারমকী ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বারমকীরা ধর্মান্তরিত মুসলমান হলেও ভারতীয় প্রবণতার ফলে তাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতিষবিদ্যা, ওষুধ-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য আরব পন্ডিতদের ভারতে পাঠাতেন। তাঁরা হিন্দু পন্ডিতদের বাগদাদে আসতেও আমন্ত্রণ জানাতেন। এসব ভারতীয় পন্ডিত সংস্কৃত ভাষায় লেখা চিকিৎসাবিজ্ঞান, বিষবিজ্ঞান, জ্যোতিষবিদ্যা ও অন্যান্য বিষয়ক বহু গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন। বাগদাদের বহু হাসপাতালে ভারতীয় চিকিৎসকরা নিয়োজিত ছিলেন।

অনেকেই মনে করেন যে আরব্যোপন্যাসের কয়েকটি গল্প ভারত থেকে নেয়া। হিন্দু পঞ্চতন্ত্র আরবি ভাষায় 'কলিলা ও দিমনা' নামে আজও প্রচলিত রয়েছে। দাবা খেলাও আরবরা এদেশ থেকে নিয়েছিল। ভারতীয় সঙ্গীতও আরবদের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। বিখ্যাত আরব কবি জাহিজ হিন্দুদের সঙ্গীত বিদ্যার প্রশংসা করেছেন। আরবরা ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেছিল। সুফি মতবাদেও আরবদের সঙ্গে সিন্ধুর যোগাযোগ ছিল। কথিত আছে যে সুফি সাধক হযরত বায়েজিদ বোস্তামী ছিলেন একজন সিন্ধি সুফি সাধকের শিষ্য। আরব সাহিত্য, স্থাপত্য-শিল্প ও সুকুমার শিল্পও ভারতীয় প্রভাবের ফলে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। হ্যাভেল যথার্থই বলেছেন যে গ্রিস নয়, ভারতই ইসলামের প্রভাবযোগ্য যৌবনাবস্থায় ইসলামকে শিক্ষা দিয়েছিল, তাঁর দর্শন, দুর্বোধ্য ধর্মীয় আদর্শকে রূপদান করেছিল এবং এর সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রকাশকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

আব্বাসীয় বংশের পতনের পর সিন্ধুর আরব শাসকগণ বস্তুত স্বাধীন হয়ে পড়েন এবং দুদশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সারসংক্ষেপ

ভারত আক্রমণকারী মুসলমানদের মধ্যে আরবরাই প্রথম ভারতে এসেছিল। বস্তুত, ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই ভারতের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকে আরবদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রচারের পরও তা অব্যাহত থাকে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে ৬৩৬-৬৩৭ সালে মুসলমানরা প্রথম ভারতে অভিযান করে সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও এ সময় এবং পরবর্তী সময়ে খলিফাদের সাবধানী নীতির কারণে বিজয় তৎপরতা অব্যাহত থাকেনি। সম্প্রসারণবাদী ওমাইয়া খলিফাদের আমলে মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তারের অংশ হিসেবে ভারতে অভিযান পরিচালিত হয়। ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উৎসাহে আরবরা সিন্ধু আক্রমণ করে। এই অভিযান প্রেরণের পিছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথম দুটি অভিযান ব্যর্থ হয়। অত:পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযান প্রেরিত হয়। সুশৃঙ্খল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরব সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে সহজেই সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করে। কাসিম একে একে দেবল, নিরুন, সেহওয়ান, রাওয়ার, ব্রাহ্মণাবাদ, দাহিরের রাজধানী আড়রসহ মুলতান দখল করে খলিফার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু তাঁর আকস্মিক অপসারণ ও মৃত্যু এদেশে মুসলমান শাসনকে দুর্বল করে দেয়। কারণ, তাঁর অসম্পূর্ণ বিজয়াভিযান ও পরবর্তী সময়ে খলিফাদের সহযোগিতা ও সমর্থনের অভাবে সিন্ধু অঞ্চলে আরব শাসন স্থায়িত্ব লাভ করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরবদের সিন্ধু বিজয়কে নিষ্ফল বলা যায় না। রাজনৈতিকভাবে ফলাফলবিহীন হলেও এর সামাজিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরবরা সিন্ধু জয় করেন–
   (ক) ৬৩৬-৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে (খ) ৬৪৩-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে
   (গ) ৭১২ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে

২. আরবদের সিন্ধু অভিযানের সফল সেনাপতি ছিলেন–
   (ক) আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন রাবি (খ) মুহাম্মদ বিন কাসিম
   (গ) সুলতান মাহ্মুদ (ঘ) মুহাম্মদ ঘোরী

৩. সিন্ধু বিজয়ের সময় সিন্ধুর রাজা ছিলেন–
   (ক) দাহির (খ) পৃথ্বিরাজ
   (গ) জয়চন্দ্র (ঘ) আনন্দ পাল

৪. তখন সিন্ধুর রাজধানী ছিল–
   (ক) দেবল (খ) নিরুণ
   (গ) সেহওয়ান (ঘ) আড়র

৫. আরবদের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটে–
   (ক) মহানবীর সময়ে (খ) খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে
   (গ) উমাইয়া যুগে (ঘ) আব্বাসীয় যুগে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সিন্ধু বিজয়ের পূর্ববর্তী সময়ে আরবদের ভারত অভিযান বর্ণনা করুন।

২। সংক্ষেপে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক সিন্ধু অভিযানের কারণ বর্ণনা করুন।
৩। সিন্ধুতে আরব শাসন স্থায়িত্ব লাভ করেনি কেন?
৪। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সামাজিক ফলাফল কি ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। আরবদের সিন্ধু অভিযানের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন।
২। সিন্ধু বিজয়ে আরবদের সাফল্যের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন। আরবরা সিন্ধুতে স্থায়ী মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছিল কেন?
৩। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*
২। A.B.M. Habibullah, *Foundation of Muslim Rule in India.*
৩। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস।*
৪। R.C. Majumdar (ed.), *The Delhi Sultunate.*

পাঠ - ২

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- সুলতান মাহমুদের গুরুত্বপূর্ণ ভারত অভিযানগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন ;
- সুলতান মাহমুদের সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ফলাফল আলোচনা করতে পারবেন ;
- সুলতান মাহমুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতে মুসলমানদের অভিযান পরিচালিত হয়েছিল গজনীর সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে। গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলপ্তিগীন নামক জনৈক ভাগ্যান্বেষী তুর্কি মুসলমান। পারস্যের সামানিদ বংশের অধীনে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন। সামানিদ সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি গজনীতে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৭৭ সালে আলপ্তিগীনের মৃত্যুর পর তাঁর ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তিগীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সবুক্তিগীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মাহমুদ ৯৯৭ সালে গজনীর অধিপতি হন। গজনীর তুর্কি সুলতান মাহমুদই ভারতে মুসলমান অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে নায়ক।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন বীর যোদ্ধা। পিতার জীবদ্দশায় তিনি পিতার সব অভিযানেই অংশ নিয়েছিলেন। পিতার আমলে তিনি হিন্দুশাহী রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযানেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে রাজপুত্র থাকা কালেই মাহমুদ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ভারতের অতুল ধন-সম্পদের কথাও তিনি নিশ্চয় শুনেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পর পিতার নীতি অনুসরণ করে মাহমুদ সামানিদ বংশের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সামানিদ সাম্রাজ্যে অন্তর্কলহের সুযোগে মাহমুদ নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। খলিফা আল-কাদির বিল্লাহ্‌র কাছ থেকে তিনি 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা' ও 'আমিন-উল-মিল্লাত' উপাধি লাভ করেছিলেন। মাহমুদ গজনী বংশের চিরাচরিত রীতি ত্যাগ করে 'আমীরের' পরিবর্তে 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন।

ভারত আক্রমণের কারণ

বারম্বার ভারত আক্রমণ সুলতান মাহমুদের কর্মময় জীবনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সিংহাসনে আরোহণের পর সুলতান মাহমুদ প্রথমে নিজের দেশের নিরাপত্তা ও সুশাসনের ব্যবস্থা করেন এবং তারপর ভারতের দিকে মনোযোগ দেন। গজনীর সুলতান হয়েও যে সুলতান মাহমুদ ভারতীয় ইতিহাসের এক আলোচিত চরিত্র তাঁর প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর বারম্বার ভারত আক্রমণ। তেত্রিশ বছরের রাজত্বকালে (৯৯৭-১০৩০ খ্রিঃ) সুলতান মাহমুদ স্যার হেনরি ইলিয়টের মতে সতের বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন এবং প্রতিবারই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। রাজত্বের শেষ দিকে তিনি শুধু পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং মুলতান তাঁর দখলে রেখেছিলেন। এগুলো ছাড়া বিজিত বা আক্রান্ত অন্য কোনো রাজ্য বা অঞ্চল তিনি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নি। তাই তাঁর বারম্বার ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তাঁর ভারত আক্রমণের পিছনে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করেছেন। এখানে সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হল।

বারম্বার ভারত আক্রমণ করলেও একমাত্র পাঞ্জাব, মুলতান ও সিন্ধু ছাড়া (১০২১-১০২২ খ্রিঃ) ভারতের বিজিত অঞ্চলগুলো সুলতান মাহমুদ কখনো তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নি। মধ্য এশিয়ায় তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতকেও অন্তর্ভুক্ত করলে সেই সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে শাসন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কাজেই সেই অর্থে অর্থাৎ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটানোর জন্য যে তিনি ভারত আক্রমণ করেন নি তা বলা যায়। তবে এ অভিযানগুলোর পিছনে তাঁর অন্য রকম কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এ অভিযানগুলো তাঁকে 'গাজির' সম্মান দিয়েছিল যা তাঁকে সমকালীন অন্যান্য মুসলমান সুলতানদের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাছাড়া অন্যান্য মুসলমান সুলতানদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণ করার জন্য এ অভিযানগুলো থেকে তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করা ছিল অসম্ভব এবং সে কারণেই তিনি সে চেষ্টাও করেন নি।

পিতা সবুক্তিগীনের আমলেই হিন্দুশাহী রাজা জয়পালের সঙ্গে গজনী সাম্রাজ্যের যুদ্ধ ও সন্ধি হয়েছিল। কিন্তু জয়পাল এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আনন্দপালের সন্ধির শর্ত অমান্য ও গজনী সাম্রাজ্যের শত্রুদের সাহায্যদান সুলতান মাহমুদকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করেছিল। গজনী সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত ছিল জয়পালের রাজ্যের সীমান্তবর্তী।কাজেই নিজ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাছাড়া সুদূর গজনী থেকে এসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করা ছিল কষ্টসাধ্য। সে তুলনায় লাহোর ও মুলতান অঞ্চল তাঁর দখলে থাকলে সেটাকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো সহজতর ছিল। এ জন্যই রাজত্বের প্রায় শেষ দিকে সুলতান মাহমুদ এ এলাকা নিজ অধিকারভুক্ত করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সুলতান মাহমুদ বারম্বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন।এ দেশে হিন্দু ধর্মকে উৎপাটিত করে সেখানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ভারত অভিযানকালে তিনি বহু হিন্দু মন্দির লুঠ ও ধ্বংস করেছিলেন বলেই এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে ভারত অভিযানের পিছনে সুলতান মাহমুদের কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল না। এসব মন্দির লুঠ ও ধ্বংস করার পিছনে ছিল তার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য, ধর্মীয় উদ্দেশ্য নয়।

নিচের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যে তাঁর অভিযানের পিছনে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল না। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের রপ্তানী আমদানির চেয়ে অনেকগুণ বেশি ছিল। ফলে ভারত হয়ে ওঠে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী এক দেশ যা বার বার বিদেশী আক্রমণকারীদের আক্রমণে প্রলুব্ধ করেছে, এ অতুল ঐশ্বর্যই তাঁর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিভিন্ন যুগে।তাছাড়া যুগযুগ ধরে ধনী হিন্দু ব্যক্তিরা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ মন্দিরে জমা রাখত। বহু ধনী হিন্দুব্যক্তি মন্দিরে অজস্র অর্থও দান করতো। ফলে মন্দিরগুলো হয়ে উঠেছিল এক একটা রত্নভান্ডার। তাঁর নিজের সাম্রাজ্যকে সুসংগঠিত করার জন্য, তাঁর সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এবং তাঁর রাজধানী গজনীকে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম শহর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সুলতান মাহমুদের প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। এ অর্থ সহজে পাওয়ার প্রধান উৎস ছিল মন্দিরগুলো। অনেক মন্দিরেই মূল্যবান রত্ন-সজ্জিত স্বর্ণ-বিগ্রহ ছিল। কাজেই বলা যায় যে প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতের মন্দিরগুলোকে তাঁর আক্রমনের লক্ষবস্তু হিসাবে স্থির করেছিলেন- এর পিছনে কোনো ধর্মীয় বিদ্বেষ বা উদ্দেশ্য ছিল না।

সুলতান মাহমুদ পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত হিন্দুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাঁরা তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী গজনীতেও শাঁখ বাজাত এবং পূজা করতো। অধ্যাপক হাবিব বলেছেন যে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের জন্য মাহমুদ বারম্বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন এ বক্তব্য ঐতিহাসিকভাবে ভুল এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে অসত্য। ইতিহাসে এমন কোনো সাক্ষ্য নেই যে তিনি বলপূর্বক বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাউকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। কখনো কোনো রাজা হয়তো তাঁর আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সুলতান মাহমুদের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের পরই সে রাজা আবার নিজ ধর্মে ফিরে গেছেন। এটা ছিল সেই রাজার আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক

চাল এবং এজন্য সুলতান মাহমুদকে দায়ী করা যায় না। ধর্মপ্রচারের জন্য স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কিন্তু ভারতে সুলতান মাহমুদের সারা সময়টাই কেটেছে যুদ্ধ বিগ্রহে - ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করার মত সময় তাঁর ছিল না। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে যেমন বহু হিন্দু সৈনিক ছিল, তেমনি বহু হিন্দু তাঁর শাসনামলে রাজ্যের উঁচু ও দায়িত্বপূর্ণ পদেও নিযুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া ভারতীয় অভিযানগুলোর ধর্মীয় উদ্দেশ্য থাকলে মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হিন্দু সৈন্যরা হয়তো যুদ্ধ করতো না। এলফিনস্টোন সুলতান মাহমুদের ধর্ম-নীতি সম্পর্কে বলেছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে বা দুর্গ দখল করতে গিয়ে ছাড়া কখনো কোনো হিন্দুকে তিনি হত্যা করেছেন এমন দৃষ্টান্ত নেই। স্যার উলসলি হেগ বলেছেন যে ইসলাম ধর্মের অনুরাগী হলেও তাঁর অধীনে বহু হিন্দু সৈনিক ছিল এবং ধর্মান্তরিতকরণ ছিল চাকরির শর্ত, এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

সুলতান মাহমুদের ভারতীয় অভিযানের ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতে তিনি শুধু হিন্দু রাজ্য বা মন্দিরই আক্রমণ করেন নি- অন্ততপক্ষে দুইবার তিনি মুসলমান রাজ্যও আক্রমণ করেছিলেন। সেখানেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। তাছাড়া মধ্য এশিয়ার পরিচালিত সুলতান মাহমুদের সব অভিযানই ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে ড. নাজিম বলেছেন যে ভারতীয় হিন্দু রাজাদের তিনি নাজেহাল করেছেন, তবে ইরান ও মধ্য এশিয়ার মুসলমান সুলতানদেরও তিনি রেহাই দেন নি। এ সব যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে সুলতান মাহমুদের ভারতীয় অভিযানগুলোর পিছনে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল না।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ বারম্বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। যুগ যুগ সঞ্চিত ভারতীয় ধন-সম্পদ লুঠ করে মাহমুদ তা নিজের সাম্রাজ্যকে সুসংগঠিত করার ও রাজধানী গজনীকে প্রাচ্যের সুন্দরতম শহর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করেছেন। অধ্যাপক হাবিব বলেছেন যে অর্থ ও ক্ষমতার লোভেই তিনি ভারত আক্রমণ করেছিলেন-এর পিছনে ইসলাম প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না।

অভিযানসমূহ

১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুলতান মাহমুদ সতের বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

ভারতে সুলতান মাহমুদের প্রথম অভিযান ছিল খাইবার গিরিপথের নিকটবর্তী কয়েকটি সীমান্ত শহরের বিরুদ্ধে। ১০০০ খ্রিস্টাব্দে সেই অঞ্চলের কয়েকটি শহর ও দুর্গ তিনি দখল করেন।

পরের বছর (১০০১ খ্রি:) তিনি তাঁর পিতার শত্রু পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। পেশোয়ারের কাছে সংঘটিত যুদ্ধে জয়পাল শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং বন্দি হন। সুলতান মাহমুদ জয়পালের রাজধানী ওয়াহিন্দ দখল করেন। বিপুল অর্থ ও পঞ্চাশটি হাতির বিনিময়ে জয়পাল সুলতান মাহমুদের সঙ্গে সন্ধি করে মুক্তিলাভ করেন। বারম্বার পরাজয়ের গ্লানিতে জয়পাল সিংহাসন ত্যাগ করে অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

সুলতান মাহমুদের তৃতীয় অভিযান পরিচালিত হয় ভেরার বিরুদ্ধে। সেখানকার রাজা বিজি রায় কর দিতে অসম্মতি জানালে তিনি তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। ঝিলাম নদীর তীরে সংঘটিত যুদ্ধে বিজি রায় পরাজিত হন। প্রচুর ধন-সম্পদ এবং ২৮০টি হাতি নিয়ে সুলতান মাহমুদ ফিরে আসেন।

এরপর সুলতান মাহমুদ মুলতান আক্রমণ করেন। সেখানকার রাজা শেখ হামিদ লোদি উপঢৌকন পাঠিয়ে সবুক্তিগীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। কিন্তু তাঁর পৌত্র আবুল ফতেহ দাউদ পূর্বের নীতি ত্যাগ করে সুলতান মাহমুদের রোষানলে পড়েন। ভেরা আক্রমণের সময় ভেরার পতন সুলতানের বিপদের কারণ হতে পারে ভেবে দাউদ বিজি রায়কে সাহায্য করেছিলেন। ফলে (১০০৫-১০০৬ খ্রি:) সুলতান মাহমুদ দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। দাউদের আহ্বানে জয়পালের পুত্র আনন্দপাল তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে

আসেন। কিন্তু যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান ও পরে সুলতান মাহমুদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্তানুসারে তিনি সুলতান মাহমুদকে বার্ষিক ২০,০০০ দিরহাম কর দিতে স্বীকার করেন। ঐ সময় জয়পালের এক পৌত্র সুখপাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং নওয়াশ শাহ নাম গ্রহণ করেন। সুলতান মাহমুদ তাঁকে ভেরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

১০০৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ সুখপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তুর্কিদের সঙ্গে সুলতান মাহমুদের সংঘর্ষের সুযোগে সুখপাল ইসলাম ধর্মত্যাগ করেন এবং সুলতান মাহমুদের কর্মচারীদের বিতাড়িত করেন। বলখের যুদ্ধের পর সুলতান মাহমুদ ভেরার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর ভেরা পৌঁছানোর আগেই তাঁর কর্মচারীরা সুখপালকে বন্দি করে তাঁর সামনে হাজির করে। সুখপাল চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিতে বাধ্য হন এবং বাকী জীবন বন্দিদশায় কাটান।

সুলতান মাহমুদের ষষ্ঠ অভিযান ছিল আনন্দপাল ও উত্তর ভারতীয় হিন্দু রাজাদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে। শতদ্রু নদীর অপর তীরের মন্দিরগুলোর ধন-রত্ন লুণ্ঠন করা ছিল সুলতান মাহমুদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য।আনন্দপাল উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, কনৌজ, দিল্লি ও আজমীরের রাজাদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানালে তাদের সম্মিলিত বাহিনী সুলতান মাহমুদকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে আনন্দপালের নেতৃত্বে ওয়াহিন্দে উপস্থিত হয়। এটাই ছিল সুলতান মাহমুদের ভারতে সবচেয়ে বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আনন্দপালের হাতি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলে সম্মিলিত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং সুলতান মাহমুদের সৈন্যদের হাতে প্রচুর সংখ্যক হিন্দু সৈন্য নিহত হয়। জোটে যোগদানকারী রাজারা একে একে সুলতান মাহমুদের হাতে পরাজিত হয়ে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর ধন-রত্ন সুলতান মাহমুদকে দিতে বাধ্য হয়।এরপর সুলতান মাহমুদ কাংড়া বা নগরকোট দুর্গ দখল করেন এবং সেখানকার মন্দিরটি লুঠ করে অবিশ্বাস্য পরিমাণ ধন-রত্ন লাভ করেন। নগরকোট থেকে তিনি ৭০০,০০০ স্বর্ণ দিনার, ৭০০ মন স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র, ২০০ মন স্বর্ণ, ২০০০ মন অপরিশোধিত স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং ২০ মণ মণিমুক্তা নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর থেকেই ধন-সম্পদ লাভের আশায় হিন্দু মন্দিরগুলো আক্রমণ করতে তিনি আরো বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

১০০৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ আবার আনন্দপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে আনন্দপাল ভীত হয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন।

১০১০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ মুলতান আক্রমণ করে দাউদকে পরাজিত করেন। দাউদ বাকী জীবন ঘোরের এক দুর্গে বন্দি অবস্থায় কাটান।

পরের বছর (১০১১ খ্রিঃ) সুলতান মাহমুদ থানেশ্বর আক্রমণ করেন এবং হিন্দু মন্দিরের মূর্তি ধ্বংস করেন এবং প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

আনন্দপালের মৃত্যুর পর ত্রিলোচনপাল রাজা হন। তিনি মুসলমানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি দুর্বল শাসক হওয়ায় তাঁর পুত্র ভীমপালই রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তিনি গজনীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কও ছিন্ন করেন। ফলে ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং তাঁকে পরাজিত করেন।

১০১৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ মথুরা আক্রমণ করে সেখানকার মন্দিরগুলো ধ্বংস করেন। এরপর তিনি কনৌজ আক্রমণ করলে কনৌজের রাজা পালিয়ে যান এবং সুলতান মাহমুদের সৈন্যরা কনৌজ লুঠ করে।

১০১৯ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ ত্রিলোচনপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে তিনি পালিয়ে যান। তাঁর সৈন্যবাহিনী সুলতান মাহমুদের হাতে পরাজিত হয়।

ভারত জয় বা ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করা সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্য না হলেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে দোয়াব অঞ্চলে অভিযান চালাতে হলে অন্তত পক্ষে ঘাঁটি হিসাবে পাঞ্জাব তাঁর দখলে থাকা প্রয়োজন। ১০২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি গজনী থেকে পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে তিনি সোয়াত, বাজাউর ইত্যাদি স্থানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী উপজাতিদের পরাজিত করেন এবং তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। পাঞ্জাব দখল করে তিনি লাহোরে একজন বিশ্বস্ত গভর্নর নিয়োগ করেন।

১০২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জর আক্রমণ করলে দুই রাজ্যের রাজাই তাঁর সাথে সন্ধি করেন। গোয়ালিরের রাজা তাকে ৩৫টি এবং কালিঞ্জরের রাজা তাঁকে ৩০০টি হাতি দিয়েছিলেন।

সুলতান মাহমুদের ভারতীয় অভিযানগুলোর মধ্যে ১০২৪ খ্রিস্টাব্দে সোমনাথ আক্রমণ ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। দুর্গাধিপতি পালিয়ে গেলেও তাঁর সৈন্যরা দুর্গ রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। প্রচন্ড যুদ্ধের পর দুর্গের পতন ঘটলে সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন। সোমনাথ মন্দিরের মূর্তি তিনি ভেঙ্গে ফেলেন এবং এ মন্দির থেকে প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। মন্দির থেকে অন্যান্য মণিমুক্তা ছাড়াও সুলতান মাহমুদ ২০,০০০,০০০ দিনার পেয়েছিলেন। কথিত আছে যে, সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দিরের দেব-মূর্তি ভাঙ্গতে উদ্যত হলে ব্রাহ্মণরা প্রচুর ধনরত্নের বিনিময়ে মূর্তিটি রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু মাহমুদ ঘোষণা করেন যে ভাবীকালে তিনি মূর্তি ধ্বংসকারী হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান, মূর্তি বিক্রেতা রূপে নয়।

ভারতে সুলতান মাহমুদের শেষ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল জাটদের বিরুদ্ধে। সোমনাথ অভিযান থেকে গজনী ফেরার পথে জাটরা তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নাজেহাল করেছিল। মুলতানে পৌঁছে সুলতান মাহমুদ ১৪০০ নৌকার এক নৌ-বাহিনী গঠন করেন এবং প্রতিটি নৌযানে তীর-ধনুক ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত ২০ জন সৈনিক মোতয়েন করেন। জাটরা ৪০০ নৌকা নিয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে পরাজিত হয়।

দীর্ঘ ৩৩ বছর রাজত্ব করার পর ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন। গজনীর ফিরোজা প্রাসাদে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

সুলতান মাহমুদের সাফল্যের কারণ

শক্তিশালী হিন্দু রাজা ও বিভিন্ন রাজাদের সমন্বয়ে গঠিত জোটের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমুদের বারম্বার জয় বিস্ময়ের উদ্রেক করে।তাঁর এ সাফল্যের কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, সুলতান মাহমুদ ছিলেন নি:সন্দেহে সে যুগের শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক।তাঁর সামরিক সংগঠন ও রণকৌশল ছিল অতি উচ্চমানের। দ্বিতীয়ত, তাঁর তুর্কি অনুচরগণ ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। জেহাদের চেতনা ও ধন-সম্পদ লাভের আশা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করার প্রেরণা যুগিয়েছিল। তৃতীয়ত, হিন্দুরাজাদের অনৈক্য সুলতান মাহমুদের সাফল্যের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাঝে মাঝে হিন্দু রাজারা জোট গঠন করলেও একক নেতৃত্বে এ জোটভুক্ত বাহিনী কখনো যুদ্ধ করেনি। বিভিন্ন সেনাপতির নির্দেশে বিভিন্ন বাহিনীর যুদ্ধে অংশগ্রহণ তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয়রা মধ্য এশিয়ার পাবর্ত্য অঞ্চলের তুর্কিদের তুলনায় দৈহিক শক্তিতে দুর্বল ছিল। তবে তুর্কিদের তুলনায় ভারতীয়রা ছিল সংখ্যায় অনেকগুণ বেশি। একক সেনাপতির নির্দেশে পরিচালিত হলে ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্য তাদের জয় নিশ্চিত করতে পারতো। কিন্তু ঐক্যের অভাবে স্বল্পসংখ্যক তুর্কিদের আক্রমণ প্রতিহত করা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব হয়নি। চতুর্থত, হিন্দুদের সামরিক পদ্ধতি ছিল দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত। ভারতীয়রা যুদ্ধে হাতির ওপর ছিল অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। কিন্তু এই বিরাটাকার প্রাণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে সঠিকভাবে পরিচালনা করা ছিল কষ্টসাধ্য। সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেও আনন্দপালের হাতির যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ফলাফল

সুলতান মাহমুদের সতের বার ভারত অভিযানের ফলাফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সুলতান মাহমুদ ভারতে বিজিত অঞ্চলে তাঁর শাসনব্যবস্থা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন নি – শুধুমাত্র পাঞ্জাব, মুলতান ও সিন্ধু তিনি নিজ অধিকারে রেখেছিলেন। অন্যান্য অঞ্চল তিনি স্থানীয় শাসকদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল তিনি অধিকার করে রেখেছিলেন তাঁর মধ্য এশিয়ার সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তার প্রয়োজনে। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর রাজপুতরা উত্তর ভারতে নিজেদের শাসন আবার প্রতিষ্ঠা করেছিল। সুলতান মাহমুদের অভিযানের ফলে হিন্দু রাজা ও জনসাধারণের

মনে দারুণ ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফলে পরবর্তীকালে মুসলমানদের বিজয় ও ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন সহজ হয়েছিল। সতের বার অভিযান পরিচালনা করে সুলতান মাহমুদ উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোর সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ফলে পরবর্তীকালে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত শক্তি অনেক রাজারই ছিল না। কাজেই সুলতান মাহমুদের অভিযানের পায়ে পায়ে ভারতে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হলেও তাঁর অভিযানগুলো ভবিষ্যতে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছিল।

সুলতান মাহমুদ বারম্বার ভারত আক্রমণ করে ভারতের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ধনসম্পদ বারম্বার লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে ভারতীয় রাজ্যগুলো প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এ লুণ্ঠিত ধনসম্পদ দিয়ে গজনী সাম্রাজ্য সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। তাঁর সামরিক বাহিনী হয়ে ওঠে আরো শক্তিশালী। গজনীতে বিভিন্ন সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করা হয় যা গজনী প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর নগরীতে পরিণত করে।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের কিছু সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ফলও লক্ষ করা যায়। তাঁর অভিযানের ফলে মুসলমান ও হিন্দু সভ্যতা আরো কাছাকাছি আসে এবং এই দুই সংস্কৃতির পারস্পরিক যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়। মুসলমান সৈন্যদের সাথে বহু পন্ডিত ও দরবেশ এদেশে এসেছিলেন। তাঁদের প্রভাব সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

চরিত্র - কৃতিত্ব

ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের মত সুলতান মাহমুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর প্রশংসায় যেমন কেউ কেউ পঞ্চমুখ, তেমনি তাঁর নিন্দুকেরও অভাব নেই। কারো চোখে তিনি ছিলেন দরবেশ, আবার কেউ তাঁকে এক লুটেরা সর্দাররূপে অভিহিত করেছেন, রক্তপাত ও লুঠতরাজেই ছিল যার আনন্দ। তবে ড. নাজিম ঠিকই বলেছেন যে, তিনি কোনোটাই ছিলেন না।

মানুষ হিসাবে সুলতান মাহমুদ ছিলেন স্নেহশীল এবং আত্মীয়দের প্রতি দয়ালু। তাঁর ভাই ইসমাইল ছিলেন সিংহাসনের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তাকেও তিনি যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় তাকে গজনী থেকে জুজনানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে তিনি জীবনের বাকী দিনগুলো শান্তিতেই কাটিয়েছিলেন। তাঁর অন্য এক ভাই আবুল মোজাফ্ফর নসরকে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সামরিক পদ দেওয়া হয়েছিল। তাকে সিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নরও নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ দুই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। সবুক্তিগীনের মৃত্যুকালে সুলতান মাহমুদের অন্য ভাই আবু ইয়াকুব ইউসুফ ছিলেন নিতান্তই শিশু। সুলতান মাহমুদ তাঁর দুই পুত্রের সঙ্গে আরও শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং নসরের মৃত্যুর পর তাকে ঐ পদে নিয়োগ করেছিলেন। সুলতান তাঁর পুত্রদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। প্রথাগত শিক্ষাদান ছাড়াও তাদেরকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হতো এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দক্ষ ওয়াজিরদের তত্ত্বাবধানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের শাসন কাজে নিয়োগ করা হতো।

সুলতান মাহমুদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। অধ্যাপক হাবিব বলেছেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সুলতানদের চেয়ে ভিন্নতর ছিলেন না এবং সমসাময়িক সুলতানদের মত তিনিও যুদ্ধ, নারী এবং মদ পছন্দ করতেন। তবে ড. নাজিম বলেছেন যে, সুলতান মাহমুদ ইসলামের নৈতিক অনুশাসন মেনে চলতেন এবং মনে হয় যে শরিয়ত অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে বেশি স্ত্রী তাঁর ছিল না। মাঝে মাঝে তিনি শখ করে মদ পান করলেও কখনও মদ্যাসক্ত ছিলেন না।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন একগুয়ে ও অনমনীয় এবং তাঁর মতের বিরোধিতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না - মধ্যযুগের বিজেতা ও সুলতানদের এগুলো ছিল সাধারণ চারিত্রিক ত্রুটি। কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করার মত হৃদয়ের উদারতাও তাঁর ছিল।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন অসীম সাহসী। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সামনে থাকতেন এবং সবচেয়ে বিপদসংকুল স্থানে সৈন্যদের সাথে একসঙ্গে যুদ্ধ করতেন। কথিত আছে যে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে তাঁর শরীরে ৭২টি ক্ষতচিহ্ন ছিল। সুলতানের ব্যক্তিগত শৌর্য ও নির্ভীকতা তাঁর সৈন্যদের মনে সাহস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করতো।

সেনাপতি হিসাবে সুলতান মাহমুদ ছিলেন দক্ষ ও অভিজ্ঞ। তাঁর রণ পরিকল্পনা ছিল প্রয়োগসিদ্ধ। ইরাক থেকে দোয়াব এবং খাওয়ারিজম থেকে কাথিয়াওয়াড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তিনি অতুলনীয় শক্তি ও সাফল্যের সঙ্গে সারা জীবন যুদ্ধ করেছেন। রণবিদ্যায় তিনি নতুন কিছু আবিষ্কার বা যোগ করেননি, কিন্তু সেনাবাহিনীতে তিনি নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন। আরব, খলজী, আফগান, তুর্কি, হিন্দু- ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত ছিল তাঁর সৈন্যবাহিনী। কিন্তু কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ফলে তিনি সেই সৈন্যবাহিনীকে অপরাজেয় করে তুলেছিলেন। সারাজীবন যুদ্ধ করলেও তিনি কখনও পরাজয় বরণ করেননি। তিনি ছিলেন একজন সাহসী কিন্তু সাবধানী সেনাপতি। শত্রুকে পরাজিত করার মত শক্তি সঞ্চয় না করে তিনি কখনও আক্রমণ করতেন না। অধ্যাপক হাবিব বলেছেন যে, তিনি কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যর্থ হননি, কারণ জয়ের সম্ভাবনাহীন কোনো যুদ্ধ তিনি করেন নি। তরবারি ছিল সুলতান মাহমুদের প্রিয় যুদ্ধাস্ত্র। কিন্তু তীর চালনায়ও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। তাঁর গ্রীষ্মকাল কাটতো মধ্য এশিয়ায় অভিযানে- শীতকালে তিনি বের হতেন ভারত অভিযানে। তাপ বা শৈত্য, প্রাকৃতিক বাধা, কোনো কিছুই তাঁর অভিযানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।ঘোরের দুর্গম শৈলশ্রেণী, কাশ্মিরের বরফঢাকা পাহাড়ি গিরিপথ, ভারতের উত্তাল নদী বা মুষলধারে বৃষ্টি, রাজপুতনার তপ্ত মরুভূমি - কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারে নি।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন একজন ন্যায় বিচারক। সকলকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে তিনি তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। আইনের চোখে সবাই ছিল সমান - উচ্চবংশ, আত্মীয়তা বা পদমর্যাদার কারণে কেউ আইনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই ন্যায় বিচার পেতো।

কবি ও বিদ্বান ব্যক্তি হিসাবে সুলতান মাহমুদের খ্যাতি ছিল। কথিত আছে যে তফ্রিদুল ফুরু নামে ফিকাহ্ শাস্ত্রের একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। দরবারে তিনি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।

সুলতান মাহমুদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর দরবার তখন মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তাদের জন্য সুলতান বছরে ৪০০,০০০ দিরহাম খরচ করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ফার্সি সাহিত্যের প্রচন্ড উৎকর্ষ হয়। তাঁর দরবারে সমবেত কবিদের মধ্যে আবুল কাসিম ফেরদৌসী, আবুল কাসিম হাসান বিন আহমদ উনসুরি, ফারুকী, আমজাদী প্রমুখরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তাঁর দরবারে এবং সম্ভবত তাঁর অনুরোধে ফেরদৌসী তাঁর অমরকাব্য শাহনামার বৃহত্তর অংশ রচনা করেছিলেন। কিন্তু রাজকবি উনসুরির ঈর্ষার কারণে ফেরদৌসী তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করতে পারেননি। গণিতশাস্ত্রবিদ, দার্শনিক ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ আবু রায়হান আল-বেরুনী, ঐতিহাসিক উতবী ও বইহাকী এবং দার্শনিক আল ফারাবীও সুলতান মাহমুদের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের তিনি তাঁর দরবারে সমবেত করেছিলেন। তাঁর দরবারে ৪০০ কবির সমাবেশ ঘটেছিল। গজনীতে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু মূল্যবান গ্রন্থে পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থাগারও ছিল। বিভিন্ন অভিযানে তিনি শুধু ধনরত্নই আহরণ করেননি, তা আক্রান্ত স্থানের গ্রন্থাগারগুলো থেকে বহু মূল্যবান গ্রন্থও তিনি গজনীতে নিয়ে এসেছিলেন।

সুলতান মাহমুদ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পীর দরবেশদের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি। বহু দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি বিখ্যাত দরবেশ আবুল হাসান খারকানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনুসন্ধিৎসু। প্রথমে তিনি ছিলেন হানাফী মতাবলম্বী। কিন্তু পরে পর্যায়ক্রমে তিনি কারামতীয় ও শাফি মতাবলম্বী হয়েছিলেন। তাঁর এ ধরনের ধর্মীয় মত পরিবর্তন থেকে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্মপালনের ক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদ ছিলেন অতি সতর্ক। তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন এবং রোজ কোরআন শরীফ পড়তেন। রোজার মাসে তিনি নির্ধারিত হারে যাকাত দিতেন ও রোজা রাখতেন। তাছাড়া প্রতিদিনই তিনি দীন-দরিদ্রদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করতেন। হজ্ব পালনের ইচ্ছা থাকলেও রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে হজ্বযাত্রীদের সম্ভাব্য সকল রকম সুযোগ-সুবিধা দানে তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

সুলতান মাহমুদ পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর আমলে হিন্দুরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতো। রাজধানী গজনীতে হিন্দুদের জন্য পৃথক আবাসিক এলাকা তৈরি করা হয়েছিল এবং সেখানে তাঁরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতো। সন্ধ্যায় গজনীর হিন্দু এলাকা শাঁখ ও ঘন্টাধ্বনি শোনা যেতো। ভারতে তিনি বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন- কিন্তু তাঁর পিছনে অর্থনৈতিক কারণ ছিল- ধর্মীয় নয়। তিনি কখনও কোনো হিন্দুকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন নি। তাঁর সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে বহু হিন্দু কর্মচারী ছিল এবং তাদের অনেকেই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

স্থাপত্য-শিল্পের প্রতিও সুলতান মাহমুদের অনুরাগ ছিল। ভারত থেকে নেওয়া ধন-সম্পদ দিয়ে তিনি গজনী নগরীকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছিলেন। গজনীতে তিনি অত্যন্ত সুন্দর এক মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। গজনীতে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারও নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বহু মিনার, সেতু ও বাধ নির্মাণ করেছিলেন। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব সত্ত্বেও বাধটি এখনও ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রয়েছে। শুষ্ক মওসুমে গজনীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় কৃষি সেচের উদ্দেশ্যে এই বাধ নির্মাণ করা হয়েছিল। গজনীর নিকটে তাঁর সমাধি-সৌধ এবং দুটি মিনার আজও বিদ্যমান। সুলতানের অনুকরণে অভিজাতরাও বহু সুন্দর ইমারত ও বাগান নির্মাণ করেছিলেন। ফলে তাঁর রাজত্বকালে গজনী ও প্রাদেশিক রাজধানী শহরগুলো প্রাসাদ, মসজিদ, বাগান ইত্যাদিতে সৌন্দর্য মন্ডিত হয়ে উঠেছিল।

সুলতান মাহমুদ এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি ছিলেন গজনী, বুস্ত এবং বলখের শাসক। ক্রমে ক্রমে তিনি খোরাসান, সিস্তান, ঘোর, খাওয়ারিজম, কাফিরিস্তান, ইস্পাহান ইত্যাদি এলাকাও জয় করেন। ভারতে তিনি হিন্দুশাহী রাজাদের কাছ থেকে লামাঘান থেকে বিপাশা নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন। তাছাড়া বহু ভারতীয় রাজা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। তাঁর সাম্রাজ্য ইরাক ও কাস্পিয়ান সাগর থেকে গঙ্গা নদী এবং আরল সাগর থেকে ভারত মহাসাগর, সিন্ধু ও রাজপুতনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে তাঁর সাম্রাজ্য ছিল প্রায় ২০০০ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে এর প্রস্থ ছিল প্রায় ১৪০০ মাইল। গজনী থেকে এই বিশাল সাম্রাজ্য সুশৃঙ্খলভাবে শাসন করা অসম্ভব হবে ভেবে তিনি তাঁর সাম্রাজ্য তাঁর দুই পুত্র মাসুদ ও মুহাম্মদের মধ্যে ভাগ করে দেন। সাম্রাজ্য ভাগ নিয়ে অবশ্য তাঁর পুত্রদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর আগে সুলতান মাহমুদ মাসুদকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। সাম্রাজ্য ভাগ ও উত্তরাধিকারী নির্বাচনে সুলতান মাহমুদ দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নি। মাসুদ শাসক হিসাবে অধিকতর যোগ্য জেনেও তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা সুলতানের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাসুদই সিংহাসন লাভ করেছিলেন।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি, সফল বিজেতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ড. নাজিম তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন যে কিছু কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সুলতান মাহমুদ ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ও বিজেতা। সুলতান মাহমুদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মাসুদ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে, মাহমুদের মত মানুষ আর কোনোদিন জন্মগ্রহণ করবে না।

সারসংক্ষেপ

ভারতে মুসলিম আগমনের দ্বিতীয় পর্যায়ের নায়ক ছিলেন গজনীর সুলতান মাহমুদ। ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভারত আক্রমণের পিছনে ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল না। বরং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। ভারতের ধনরত্ন আহরণ করে নিজ সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর অভিযানগুলোর মধ্যে সোমনাথ দুর্গে

আক্রমণ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিজীত রাজাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

সুলতান মাহমুদের অভিযানের ফলে ভারতে মুসলিম শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও পরবর্তীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিল।

সুলতান মাহমুদ কেবল দক্ষ সমরনায়কই ছিলেন না। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে তিনি গজনী রাজ্যকে সমসাময়িক বিশ্বে সুপরিচিত করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মাহমুদ কোথাকার সুলতান ছিলেন–

ক. ঘোর　　খ. গজনী

গ. খাওয়ারিজম　　ঘ. ভারত

২। সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেছিলেন–

ক. ১৫　　খ. ১৭

গ. ১৮　　ঘ. ২০ বার

৩। সুলতান মাহমুদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিযান ছিল–

ক. পাঞ্জাব　　খ. সিন্ধু

গ. রাজপুতনা　　ঘ. সোমনাথ

৪। সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল–

ক. অর্থনৈতিক　　খ. রাজনৈতিক

গ. সামাজিক　　ঘ. ধর্মীয়

৫। সুলতান মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন–

ক. ১০২৫　　খ. ১০২৭

গ. ১০৩০　　ঘ. ১০৩১ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সুলতান মাহমুদের বারম্বার ভারত অভিযানের পিছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান– ব্যাখ্যা করুন।

২। সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করুন।

২। সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহের উল্লেখপূর্বক তাঁর সাফল্যের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করুন।

৩। সুলতান মাহমুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India.*

২। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*

৩। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস।*

৪। R.C. Majumdar, *The History and Culture of the Indian People*, Vol-*Delhi Sultunate.*

পাঠ - ৩

মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- মুহাম্মদ ঘোরীর বিভিন্ন অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন ;
- মুহাম্মদ ঘোরীর সাফল্যের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- মুহাম্মদ ঘোরীর চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন ;
- মুহাম্মদ ঘোরীর অভিযানের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের ভারত অভিযান পরিচালিত হয় ঘোর থেকে। মুহাম্মদ বিন কাসিম ও সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম দুটি অভিযানের ফলে ভারতে মুসলমানদের শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও তৃতীয় পর্যায়ের অভিযানের ফলে ভারতে মুসলমানদের দীর্ঘস্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৃতীয় পর্যায়ে ঘোরীদের আক্রমণের ফলে ভারতে রাজপুত শক্তিরও সামরিক পতন ঘটে।

ঘোর রাজ্য গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী পর্বত সঙ্কুল স্থানে অবস্থিত ছিল। শুরুতে ঘোর গজনী সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল এবং এর অধিবাসীরা ছিল তুর্কি। গজনী সাম্রাজ্যের দূর্বলতার সুযোগে ঘোরের তুর্কিরা স্বাধীন হয়ে পড়ে। ঘোরের সুলতান গিয়াসউদ্দিন ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে গজনী জয় করে তাঁর ভাই মুইজউদ্দিন মুহাম্মদের ওপর গজনীর শাসনভার ন্যস্ত করেন। মুইজউদ্দিন মুহাম্মদই ভারতের ইতিহাসে শিহাবউদ্দিন ঘোরী বা মুহাম্মদ ঘোরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুহাম্মদ ঘোরী গজনী থেকেই তাঁর ভাইয়ের প্রতিনিধিরূপে ভারতে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং উত্তর ভারতে বহু ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়। গুর্জর-প্রতিহার রাজারা উত্তর ভারতে তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সুলতান মাহমুদের বারম্বার ভারত আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক শক্তি আবারও দূর্বল হয়ে পড়ে।

সুলতান মাহমুদের মুত্যুর প্রায় ১৫০ বছর পর মুহাম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। ঘোরীর আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ভারত বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল।পাঞ্জাবে সুলতান মাহমুদের এক বংশধর খসরু মালিক রাজত্ব করছিলেন। উত্তর সিন্ধু ও মুলতান ছিল কারামতীয়দের অধীনে। নিম্ন সিন্ধু অঞ্চল ছিল সুম্‌রা বংশের শাসনাধীন। এর রাজধানী ছিল দেবল। গুজরাট ছিল বাঘেলাদের শাসনাধীন। আজমীরে রাজত্ব করছিলেন চৌহান রাজারা। ক্রমে চৌহানরা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা দিল্লি ও দখল করে নেয়।উত্তর-পূর্ব রাজপুতানাও তাঁরা অধিকার করে। মুহাম্মদ ঘোরীর আক্রমণের সময় পৃথ্বিরাজ ছিলেন দিল্লি ও আজমীরের রাজা। কনৌজে তখন রাজত্ব করতেন গাহড়বাল বংশীয় রাজা জয়চন্দ্র। চৌহান ও গাহড়বাল রাজাদের মধ্যে আবার ছিল শত্রুতা। পূর্ব ভারতে বিহারে পালরা এবং বাংলায় সেনরা রাজত্ব করছিলেন। উত্তর ভারতীয় হিন্দু রাজাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না, বরং একে অপরের শত্রু ছিলেন। তাঁদের এই অনৈক্য মুহাম্মদ ঘোরীর সাফল্যের সহায়ক হয়েছিল।

মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের কারণ

মুহাম্মদ ঘোরী ছিলেন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। স্বভাবতই একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে তিনি ছিলেন আগ্রহী। তবে তাঁর ভারত আক্রমণের বিশেষ কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, সুলতান মাহমুদের মত ঘোরীরাও মধ্য এশিয়ায় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে অঞ্চলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সেলজুক তুর্কি ও খাওয়ারিজম শাহ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। একাধিকবার ঘোরীরা খাওয়ারিজমের শাহের হাতে পরাজয় বরণ করে সে আশা ত্যাগ করে এবং ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়। ড. হাবিবুল্লাহ যেমন বলেছেন যে মুইজউদ্দিনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় ভারতীয় অঞ্চল জয়ের স্থান ছিল গৌণ।

দ্বিতীয়ত, সুলতান মাহমুদের পরবর্তী এক সুলতান, বাহরামের আমল থেকেই ঘোরীদের সঙ্গে গজনীর শত্রুতা ছিল। মুহাম্মদ ঘোরী গজনী দখল করে নিলেও গজনীর ইয়ামনী বংশের সুলতানরা পাঞ্জাবে রাজত্ব করছিল এবং সেখান থেকে তাঁরা সুযোগমত ঘোরও আক্রমণ করতে পারত। কাজেই পাঞ্জাব থেকে ইয়ামনী শাসকদের উচ্ছেদ করে ঘোরের নিরাপত্তা বিধান করাও ছিল মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের একটি উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত, ভারতীয় রাজাদের অনৈক্য ও অন্তর্বিবাদও মুহাম্মদ ঘোরীকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করেছিল।

মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের পিছনে ধর্মীয় কারণ ছিল বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কবি সাদী স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, পেশাদার সৈন্যরা তাদের মজুরির জন্য যুদ্ধ করেছিল। তাদের রাজা, দেশ বা ধর্মের জন্য তাঁরা যুদ্ধ করে নি।

মুহাম্মদ ঘোরীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপনে তাঁর ব্যর্থতা স্বভাবতই তাকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরী প্রথমবারের মত ভারত অভিযানে আসেন। ঐ সময় মুলতানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী কারামতীয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। গোঁড়া মুসলমানরা তাদের বিধর্মী বলে মনে করতো। মুহাম্মদ ঘোরী তাদের কাছ থেকে মুলতান জয় করেন। এর পর ১১৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরী উচ্ দুর্গ অবরোধ করেন এবং সেখানকার রাণীর বিশ্বাসঘাতকতায় দুর্গটি দখল করেন। গুজরাটের ধন-সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে মুহাম্মদ ঘোরী ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের রাজধানী আনহিলওয়ারা বা পাটান আক্রমণ করেন, কিন্তু গুজরাটের বাঘেলা রাজা মূলরাজের হাতে পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে যান। ভারতে এটাই ছিল মুহাম্মদ ঘোরীর প্রথম পরাজয়। ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পেশোয়ার দখল করলেও খসরু মালিকের কাছ থেকে লাহোর দখল করতে ব্যর্থ হন। ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরী দেবল আক্রমণ করেন এবং সমুদ্র-উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন। ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরী খসরু মালিককে পরাজিত ও বন্দি করে লাহোর দখল করেন। খসরু মালিকের পরাজয়ের ফলে ভারতে গজনীর ইয়ামনী বংশের শাসনের অবসান ঘটে। পাঞ্জাব অধিকার করার ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল জয়ের পথ মুহাম্মদ ঘোরীর জন্য উন্মুক্ত হয়। কিন্তু রাজপুতরা তাঁর অগ্রগতি রোধ করে।

রাজপুতরা ছিল বীর যোদ্ধা জাতি। গজনী ও ঘোরের তুর্কিরা মধ্য এশিয়ার সেলজুক ও অন্যান্য তুর্কিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত মুসলমানরা যুদ্ধে রাজপুতদের মুখোমুখি হয়নি। কিন্তু বীর যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও রাজপুতদের সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ও বর্ণভেদ প্রথা তাদের দূর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১১৯১ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরী সরহিন্দ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং শহরটি দখল করেন। আজমীর ও দিল্লির চৌহান রাজা পৃথ্বিরাজ পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে মুহাম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে উত্তর ভারতীয় রাজাদের নিয়ে এক জোট গঠন করেন। শুধুমাত্র কনৌজের গাহড়বাল বংশীয় রাজা জয়চন্দ্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে গঠিত এই জোটে যোগদান করেননি। কর্নেল টডের মতে জয়চন্দ্রের মেয়েকে বলপূর্বক বিয়ে করার কারণে পৃথ্বিরাজের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল এবং সে কারণেই তিনি পৃথ্বিরাজের নেতৃত্বে গঠিত জোটে যোগদান করেন নি। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পৃথ্বিরাজ মুহাম্মদ ঘোরী বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।

ফিরিশতার ভাষ্য অনুসারে পৃথ্বিরাজের নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে ২,০০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৩,০০০ হাতি ছিল। থানেশ্বরের ১৪ মাইল দূরে তরাইনে এই বাহিনী মুহাম্মদ ঘোরীর বাহিনীর মুখোমুখি হয়। তুমুল যুদ্ধের পর মুহাম্মদ ঘোরীর বাহিনী পরাজিত হয় এবং মুহাম্মদ ঘোরী নিজেও আহত হয়ে স্বদেশে ফিরে যান। পৃথ্বিরাজ সরহিন্দ পুনর্দখল করেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে তরাইনের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুহাম্মদ ঘোরী দমে যান নি। দেশে ফিরে এসে তিনি এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে পৃথ্বিরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। আফগান, তুর্কি ও ইরানি সৈন্য নিয়ে গঠিত তার বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা ছিল ১,২০,০০০ এবং এর সঙ্গে ছিল ১২,০০০ অশ্বারোহী। পৃথ্বিরাজের নেতৃত্বে হিন্দুরাজাদের সম্মিলিত বাহিনী আগেই তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছিল।সারাদিন তুমুল যুদ্ধের পর সন্ধ্যায় মুহাম্মদ ঘোরী জয়লাভ করেন। পৃথ্বিরাজ বন্দি ও নিহত হন। বীরত্বে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না।কিন্তু হিন্দুদের চিরাচরিত যুদ্ধরীতিতে হাতির ওপর নির্ভরশীলতা এবং সর্বোপরি সম্মিলিত বাহিনীর পরিচালনায় সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত একক-অধিনায়কত্বের অভাবের ফলে তাদের পরাজয় ঘটে।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বলা যেতে পারে যে, রাজপুতদের এই জোটের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ঘোরীর জয় ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর পর মুহাম্মদ ঘোরী এবং তাঁর সেনাপতিরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে এই দেশে মুসলিম রাজ্যের বিস্তার ঘটান।

হিন্দুদের জন্য তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল দুর্ভাগ্যজনক।এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাজপুতদের প্রতিরোধ শক্তি ভেঙ্গে পড়ে। এর পর ভারতের হিন্দুরা মুসলমানদের বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আর কোনো জোট গঠন করতে সক্ষম হয়নি। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুসলমানদের অধিকার প্রায় দিল্লির উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হান্‌সি, সামানা, কোহরাম, বাকুহারাম ও অন্য বেশ কয়েকটি দুর্গ মুহাম্মদ ঘোরীর করতলগত হয়। আজমীর রাজ্য মুহাম্মদ ঘোরীর হাতে বিধ্বস্ত হয়। মুহাম্মদ ঘোরী আজমীরের হিন্দু মন্দির ও অন্যান্য বহু ইমারত ধ্বংস করেন এবং সেখানে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। বাৎসরিক কর দানের শর্তে আজমীর শহরটি পৃথ্বিরাজের পুত্রের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর মুহাম্মদ ঘোরী কুতুবউদ্দিন নামে তাঁর এক বিশ্বস্ত অনুচরকে তাঁর বিজিত ভারতীয় অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করে গজনী ফিরে যান। কুতুবউদ্দিন ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি জয় করেন এবং একে একে মীরাট, কোল, গোয়ালিয়র ইত্যাদি দখল করেন। কুতুবউদ্দিন দিল্লিতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।

চৌহানদের ধ্বংস করে দিল্লি, আজমীর দখল করলেও মুসলমানরা তখনও ভারতের প্রভু হতে পারেনি। দোয়াব অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন জয়চন্দ্র। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা এবং পূর্বদিকে তাঁর রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজধানী কনৌজ ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক শহর। উল্লেখ্য যে তরাইনের যুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে জয়চন্দ্র পৃথ্বিরাজের নেতৃত্বে গঠিত হিন্দু জোটে যোগদান করেন নি। সম্ভবত তিনি মনে করেছিলেন যে সুলতান মাহমুদের মত মুহাম্মদ ঘোরীও যুদ্ধে জয়লাভের পর ধন-রত্ন নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন এবং পৃথ্বিরাজের পরাজয় উত্তর ভারতে তাঁর নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয় নি। ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরী জয়চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। জয়চন্দ্রও এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হন। এ সময় আগের মত কোনো সম্মিলিত জোট গঠিত হয়নি। সম্ভবত পৃথ্বিরাজের পরাজয় হিন্দুদের উৎসাহকে স্তিমিত করে দিয়েছিল।তাজুল-মাসির এবং তাবাকাৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে এ যুদ্ধের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। চান্দওয়ার ও ইটাওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সংঘটিত এ যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন এবং মুহাম্মদ ঘোরী প্রচুর ধন-রত্ন ও ৩০টি হাতি লাভ করেন। এর পর মুহাম্মদ ঘোরী বারাণসী আক্রমণ করে সেখানকার বহু মন্দির ধ্বংস করেন এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। কুতুবউদ্দিনের ওপর বিজিত অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করে এরপর মুহাম্মদ ঘোরী গজনী ফিরে আসেন। মুহাম্মদ ঘোরীর আমলেই বখতিয়ার খলজী বাংলা ও

বিহার জয় করেন (বখতিয়ার খলজীর বাংলা ও বিহার জয়ের এবং সেই অঞ্চলে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার বিবরণ নবম ইউনিটের প্রথম পাঠে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন ঘোরীর মৃত্যুর পর শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরী গজনী, ঘোর ও দিল্লির সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর রাজত্বের শেষ ভাগে (১২০৫ খ্রি:) গজনীতে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তা দমন করেন। ভারতেও খোকাররা বিদ্রোহ করলে মুহাম্মদ ঘোরী ভারতে আসেন এবং তাদের বিদ্রোহ দমন করে লাহোরে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখান থেকে গজনী প্রত্যাবর্তনের পথে ধামিয়াক নামক স্থানে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরী এক আততায়ীর হাতে নিহত হন।

মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র মাহমুদ ঘোরের সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজ্য ছিল খুবই সীমিত এবং মুহাম্মদ ঘোরীর তিনজন ক্রীতদাস তাঁর সাম্রাজ্যের তিন অংশ শাসন করতে থাকে। গজনীতে তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ, সিন্ধুতে নাসিরউদ্দিন কুবাচা এবং উত্তর ভারতে কুতুবউদ্দিন আইবক শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মাহমুদের রাজত্বকাল স্বল্পস্থায়ী ছিল। তাঁর মত্যুর পর ঘোর রাজ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং এই সুযোগে খাওয়ারিজমের শাহ ঘোর রাজ্য দখল করে ঘোর বংশের শাসনের অবসান ঘটান।

মুহাম্মদ ঘোরীর কৃতিত্ব

ভারতের ইতিহাসে শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরীর স্থান যে অতি উচ্চে সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ নেই। অধ্যাপক খালিক আহমদ নিজামী তাঁকে মধ্যযুগের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম রূপে অভিহিত করেছেন। মুসলমানদের ভারত অভিযানের তৃতীয় পর্যায়ে মুহাম্মদ ঘোরীর নেতৃত্বেই ভারতে দীর্ঘস্থায়ী মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ ঘোরী ছিলেন একজন সামরিক প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিন ঘোরীর অধীনে গজনীর শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর জীবন শুরু হলেও নিজ প্রতিভা ও দক্ষতাবলে তিনি ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়েও তিনি হতোদ্যম হননি। পরের বছর একই স্থানে তিনি হিন্দুদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে উত্তর ভারতে মুসলমান রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর দূর্বলতার সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান মাহমুদের মত বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস করলেও তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল প্রখর। তিনি ধন-রত্ন লুঠ করেই ক্ষান্ত হননি; শুরু থেকেই ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তিনি এদেশে বারম্বার অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সে জন্যই কোনো অঞ্চল জয় করার পর তিনি সেখানে স্থায়ী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ঘোর সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলেও ভারতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বহুদিন টিকে ছিল। ভারতে নিজের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও তিনি তাঁর কয়েকজন অনুচরকে যথাযোগ্য প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন যারা ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। বিশ্বস্ত অনুচর নির্বাচনে তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। বস্তুত আইবক, ইয়ালদুজ, কুবাচার মত অনুচররাই ছিল তাঁর সাফল্যের মূলস্তম্ভ। মুহাম্মদ ঘোরীর রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করে তাকে নি:সন্দেহে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক বলা চলে।

সারা জীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় জ্ঞান-বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রতি নজর দেওয়ার তেমন কোনো সময়-সুযোগ তিনি পাননি। তবুও ঘোরের সাংস্কৃতিক বিকাশে তাঁর অবদান তুচ্ছ নয়। তাঁর আমলে ঘোর শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিখ্যাত দার্শনিক ও পন্ডিত ফখরউদ্দিন রাজী এবং কবি নিজামি তাঁর দরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন। ইউ. স্ক্রেটো মনে করেন যে গজনীতে দৃষ্ট চকচকে টালির ব্যবহার মুহাম্মদ ঘোরীর আমলেই শুরু হয়েছিল। দানশীলতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার প্রশংসা করেছেন। ফিরিশতা তাঁকে একজন খোদা-ভক্ত, জনকল্যাণকামী ও ন্যায়বান সুলতান রূপে অভিহিত করেছেন। মুহাম্মদ ঘোরী ন্যায়বিচারক ছিলেন। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির প্রতিও তিনি যত্নশীল ছিলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিনের প্রতিনিধিরূপেই মুহাম্মদ ঘোরী ভারত অভিযান করেছিলেন। তিনি বড় ভাইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলতেন। যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত গণিমতের মালের মূল্যবান জিনিষগুলোও তিনি বড় ভাইয়ের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর ভ্রাতৃ-ভক্তি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘোরীর জীবনী পর্যালোচনা করলে দুজনের মধ্যে যেমন কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় তেমনি কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়। দুজনই তরবারির মাধ্যমে যশ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সমরনায়ক হিসাবে সুলতান মাহমুদের তুলনায় মুহাম্মদ ঘোরী প্রায় অখ্যাত রয়ে গেছেন। সামরিক অভিযানে সুলতান মাহমুদ ভারতে বা ভারতের বাইরে কোথায়ও কখনো পরাজয় বরণ করেননি। কিন্তু মুহাম্মদ ঘোরী ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটে এবং ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

সুলতান মাহমুদ এবং মুহাম্মদ ঘোরী দুজনই গজনী থেকে তাঁদের ভারত অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। সুলতান মাহমুদ ছিলেন গজনীর স্বাধীন ও সার্বভৌম সুলতান, অন্যদিকে মুহাম্মদ ঘোরী ছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা গিয়াসউদ্দিন ঘোরীর অধীনে গজনীর শাসনকর্তা। অবস্থানগত এই পার্থক্য এ দুজনের সামরিক সুযোগ-সুবিধার কিছু পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই- তবে এ দুজনের অভিযানের উদ্দেশ্যও ছিল ভিন্নতর। সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেছিলেন মূলত: ধন-রত্নের লোভে। ভারত থেকে ধন-রত্ন নিয়ে তিনি গজনী সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছেন। নিরাপত্তার খাতিরে পাঞ্জাব ও সিন্ধু রাজত্বকালের প্রায় শেষভাগে নিজের অধিকারে রাখলেও ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কোনো উদ্দেশ্য সুলতান মাহমুদের ছিলনা। মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে স্থাপিত সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতকেও যুক্ত করলে তা শাসন করা হবে অসম্ভব – এ বাস্তব উপলব্ধি থেকেই সুলতান মাহমুদ ভারতের বিজিত অঞ্চলগুলো নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। অন্য দিকে মুহাম্মদ ঘোরী শুরু থেকেই এদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই ভারত অভিযানে বের হয়েছিলেন। এর অবশ্য বাস্তব কারণও ছিল- খাওয়ারিজমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপন করা মুহাম্মদ ঘোরীর পক্ষে সম্ভব ছিলনা বলেই তিনি ভারতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং এদেশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এখানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। কাজেই বলা যায় যে দুজনই ছিলেন বাস্তববাদী ও নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সফল।

মানুষ ও শাসক হিসাবে সুলতান মাহমুদ মুহাম্মদ ঘোরীর চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতিমান। মুহাম্মদ ঘোরী ছিলেন মূলত: একজন রণ-নেতা। যুদ্ধ বিগ্রহ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তাঁর সারা জীবন কেটে যায়। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার তেমন সময় বা সুযোগ কোনোটাই তাঁর ছিল না। তবুও তিনি স্বল্প পরিসরে তা করার চেষ্টা করেছিলেন। অন্যদিকে এ ক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদের ছিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তাঁর দরবার ছিল কবি, জ্ঞানী-গুণী, শিল্পী-সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদের তুলনায় মুহাম্মদ ঘোরী নিস্প্রভ। তবে ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অগ্রনায়ক এবং সে কারণেই মুহাম্মদ ঘোরী ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের সাফল্যের কারণ

বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। হাসান নিজামি, মিনহাজ এবং ফখর-ই-মুদাব্বিরের মত সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা এর কোনো ব্যাখ্যা দেননি, যদিও শেষোক্ত জন তুর্কিদের অশ্বারোহী সৈন্য ও ভারতের সামন্ত প্রথাকে এই সাফল্যের কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে, ইসলাম তাঁর অনুসারীদের তিনটি বিশিষ্ট গুণের অধিকারী করেছিল যা আরব, বার্বার, পাঠান এবং তুর্কিদের মত স্বভাবসিদ্ধ সৈনিকদের বিস্ময়কর সামরিক দক্ষতার অধিকারী করেছিল। প্রথমত, আইনসম্মত পেশাগত অবস্থান ও ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ছিল সমযোগ্যতা ও সংহতি। ফলে জাতি ও বর্ণের সব বৈষম্য দূরীভূত করে সবাই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছিল। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা তাই হবে- এ অদৃষ্টবাদ যুদ্ধে তাদের মরণপণ লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তৃতীয়ত, মদ্যপান ইসলামে নিষিদ্ধ এবং যে কোনো মুসলমান রাষ্ট্রে আইনত দন্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত। অন্যদিকে রাজপুত, মারাঠা এবং অন্যান্য হিন্দু সৈন্যদের ধ্বংসের কারণ ছিল মদ্যাসক্তি। মদ্যাসক্ত হিন্দু সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্যরা দূরদর্শী সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং সুচারুরূপে যুদ্ধ পরিচালনায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ভারতীয়দের শান্তিবাদ ও যুদ্ধের প্রতি ঘৃণাকে তাদের পরাজয়ের কারণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন যা ঠিক নয়। যুদ্ধ ছিল রাজপুতদের পেশা এবং একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাস অন্তর্ঘাতী সংগ্রাম, যুদ্ধ সংঘাতে পরিপূর্ণ। মুসলমানদের ধর্মীয়

উন্মাদনাকে কেউ কেউ এ সাফল্যের কারণরূপে গণ্য করেছেন। এ সাফল্যের পিছনে ধর্মীয় উৎসাহ কিছুটা দায়ী হলেও হতে পারে, তবে শুধু এটাই একমাত্র কারণ ছিল না। তাছাড়া মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারত-আক্রমণকারী সকল তুর্কি উপজাতি সম্পূর্ণভাবে তখনো ধর্মান্তরিত হয়নি।

ভারত বিজয়ে তুর্কিদের সাফল্যের অনেক কারণ ছিল। ভারতীয়দের পরাজয়ের বড় কারণ ছিল তাদের সমাজ-ব্যবস্থা ও বিদ্বেষজনক বর্ণ-বৈষম্য যা তাদের সামরিক সংগঠনকে দূর্বল করে ফেলেছিল। বর্ণবৈষম্য সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল।এমনকি ধর্মেও ছিল এক বিশেষ শ্রেণীর একাধিপত্য। ফলে ঘোরীর আক্রমণের সম্মুখীন হলে ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার মত তাদের কিছুই ছিলনা। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকায় তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করতে পেরেছিল।

বর্ণভেদ-প্রথা রাজপুতদের সামরিক দক্ষতাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। যুদ্ধ একটি শ্রেণীর পেশা হওয়ায় সেই শ্রেণী থেকেই সৈনিকদের নির্বাচন করতে হতো। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সামরিক প্রশিক্ষণের সুযোগ থেকে ছিল বঞ্চিত। নিম্নবর্ণের মানুষের স্পর্শ উচ্চবর্ণের ধর্মনষ্ট করে এ ধারণার কারণে সৈন্যদের মধ্যে শ্রম-বিভক্তি সম্ভব ছিল না। ফলে একই লোককে যুদ্ধ করা থেকে পানি আনা, রান্না করা ইত্যাদি সব কাজই করতে হতো যা সেনাবাহিনীর কার্যকারিতা অনেক কমিয়ে ফেলে।

মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধরীতির অগ্রগতি সম্পর্কে ভারতীয়রা ছিল অজ্ঞ। ভিনসেন্ট স্মিথ যেমন বলেছেন যে, কোনো হিন্দু সেনানায়ক শত্রুর যুদ্ধ কৌশল শিখে নিজেদের সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো চেষ্টা কোনোদিনই করেন নি। আলেকজান্ডারের আমল থেকেই বিদেশীদের যুদ্ধ কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে আসছিল। কিন্তু তবুও ভারতীয় রাজারা সামরিক পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন বা উন্নতি করার চেষ্টা করেননি। সামরিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের স্থবিরতা তাদের পরাজয়ের একটা বড় কারণ।

মুসলমান আক্রমণকারীরা এক নেতার অধীনে যুদ্ধ করতো। অন্যদিকে হিন্দু-রাজারা কখনো কখনো ঐক্যবদ্ধ হলেও তাদের সেনাবাহিনী বিভিন্ন রাজার নেতৃত্বে যুদ্ধ করতো। সর্বময় একক অধিনায়কত্বের অভাব তাদের পরাজয়ের একটা কারণ ছিল। তাছাড়া মুসলমান আক্রমণকারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সংগঠন ক্ষমতা ছিল অত্যধিক। বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিবদমান হিন্দুরাজাদের পক্ষে সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মুসলমান আক্রমণকারীদের প্রতিহত করা ছিল কঠিন।

গতিময়তা ছিল তুর্কিদের সামরিক সংগঠন ও সাফল্যের চাবিকাঠি। প্রধানত যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত দ্রুতগতি সম্পন্ন অশ্বারোহী সৈনিক ছিল তুর্কি বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যদিকে ভারতীয়রা ছিল বিশালাকৃতির কিন্তু শ্লথ-গতির হাতির ওপর বেশি নির্ভরশীল। যুদ্ধক্ষেত্রে হাতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ রাখাও ছিল কষ্টসাধ্য। দ্রুতগতি সম্পন্ন তুর্কি অশ্বারোহী বাহিনী সহজেই ভারতীয় হস্তিবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া তুর্কিদের রসদ বহনকারী হিসাবে ব্যবহৃত হতো দ্রুতগামী উট, যার জন্য আলাদা কোনো পশু-খাদ্যের প্রয়োজন হতো না, পথের পাশের ঘাস-পাতা খেয়েই এদের চলতো। অন্যদিকে হিন্দুদের রসদ বহন করতো যেসব পশু সেগুলো ছিল ধীরগতি সম্পন্ন।

গতিময়তা ছাড়াও, আর. সি. স্মেইল যেমন উল্লেখ করেছেন, তুর্কিদের কৌশলগত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁদের ধনুর্বিদ্যা। চলন্ত অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে বসেই তাঁরা তীর ছুঁড়ত। এর ফলে তাঁরা ভারতীয়দের বিশাল কিন্তু ধীর গতিসম্পন্ন হাতির বিপরীতে কিছুটা অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করেছিল।

মধ্য এশিয়ার পর্বতসঙ্কুল শীতপ্রধান দেশের দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতীয়দের দুর্বলতা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া তুর্কিরা দেশ থেকে বহুদূরে এসে যুদ্ধ করেছিল। তাঁদের সামনে দুটো পথ খোলা ছিল- হয় যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া, অথবা নিশ্চিত মৃত্যু, পালাবার কোনো উপায় তাঁদের ছিলনা।ঘোরীরাও সুলতান মাহমুদের মত মধ্য এশিয়ায় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেলজুক তুর্কি ও খাওয়ারিজমের শাহের বিরোধীতার কারণে সে চেষ্টা সফল হয়নি। কাজেই বাধ্য হয়েই তাঁরা ভারতে এসেছিল। জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে এদেশ দখল করা ছাড়া তাঁদের কোনো বিকল্প ছিলনা।

ভারত জয়ের ফলাফল

মুহাম্মদ ঘোরী উত্তর ভারত জয় ক্রমে ক্রমে কিন্তু অনিবার্যভাবে এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বহু রাজ্যে বিভক্ত উত্তর ভারত এখন অসীম ক্ষমতার অধিকারী একজন সুলতানের নিয়ন্ত্রণে আসে।কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন রাজনৈতিক সংগঠন ছিল প্রাথমিক তুর্কি সুলতানদের আদর্শ।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতীয় রাজারা নিজেদের মধ্যে বহু যুদ্ধ করেছিল। প্রচুর প্রাণহানি ও রক্তপাত ঘটেছে, কিন্তু হর্ষবর্ধনের পর কেউই উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সাধন করতে পারেনি। মুহাম্মদ ঘোরীর অভিযানের ফলে একদল বিদেশী এক প্রজন্মে সে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধান শহর ও যোগাযোগের রাস্তাগুলো দিল্লি-প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে এনে তাঁরা ক্ষুদ্র আকারে সর্ব-ভারতীয় প্রশাসনের সূচনা করে।

স্যার যদুনাথ সরকার যথার্থই বলেছেন, প্রাথমিক বৌদ্ধ আমলে এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল অষ্টম শতাব্দীতে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভারত আবার আত্ম-কেন্দ্রিক ও বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মুসলমানদের বিজয়ের ফলে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল ও আফ্রিকার নিকটতম অংশের সঙ্গে সে যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়েছিল।

তুর্কিদের উত্তর ভারত জয়ের প্রভাব নগরগুলোর ওপরও পড়েছিল। রাজপুতদের পুরনো জাত-ভিত্তিক শহরগুলো এখন উঁচু নিচু, শ্রমিক ও কারিগর, হিন্দু ও মুসলমান, চন্ডাল ও ব্রাহ্মণ-সকলের জন্যই অবারিত হয়। শ্রমিক, কারিগর, নিচু বর্ণের মানুষ সবাই নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে নতুন নতুন শহর গড়ে তোলে। অধ্যাপক হাবিব একে বলেছেন 'শহুরে বিপ্লব'।

ভারতীয় বাহিনীর প্রকৃতি ও গঠনে, তাদের নির্বাচন পদ্ধতি ও রক্ষণাবেক্ষণে তুর্কিদের বিজয়ের সামরিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। আগে যুদ্ধ করা ছিল বিশেষ এক বর্ণ বা শ্রেণীর একাধিকার, এখন সেটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, যুদ্ধ করতে সক্ষম ও ইচ্ছুকদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে শক্তিশালী স্থায়ী সেনাবাহিনীর সৃষ্টি হয়। রণনীতি ও কৌশলেও ভারতীয়রা মধ্য এশিয়ার সমকক্ষ হয়ে ওঠে। পদাতিক সৈন্যের স্থানে অশ্বারোহীরা প্রাধান্য লাভ করে, হাতির পরিবর্তে ভারতীয় বাহিনীতে অশ্বের ব্যবহার অনেকগুণে বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের পুনর্গঠিত বাহিনীর পক্ষেই মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব ছিল।

বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠার ফলে বাণিজ্যেও উন্নতি ও প্রসার ঘটেছিল। একই ভাবে আইন, শুল্ক ও মুদ্রাব্যবস্থা স্থানান্তরে ভ্রমণ ও পণ্যবহনের সহায়ক হয়েছিল।

প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত ও সরকারি ভাষার ক্ষেত্রেও তুর্কি-বিজয়ের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। আগের আমলে প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত উপভাষা ও ভাষাগুলো ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম। সমগ্র ভারতীয় ঘোর সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পর্যায়ে ফার্সির প্রচলনের ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষায় সমরূপতা আসে।

ধর্মের ক্ষেত্রেও মুহাম্মদ ঘোরীর উত্তর ভারত জয়ের প্রভাব পড়ে। তাঁর আক্রমণের সময় বহু বিখ্যাত মুসলমান সুফি-দরবেশ ভারতে এসেছিলো। মুসলমান সুফিরা বিভিন্ন তরীকায় বিভক্ত ছিলেন। প্রথম দিকে ভারতে আসা সুফিরা সোহরাওয়ার্দীয়া এবং চিশতিয়া তরীকায় বিভক্ত ছিলেন। শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (১১৮২-১২৬৭ খ্রিঃ) ভারতে সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকার গোড়াপত্তন করেন। তিনি মুলতানে বসবাস করতেন এবং মুলতানকে কেন্দ্র করে পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলে এই তরীকা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই তরীকার সুফিরা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি এবং তাঁরা জনসাধারণের সার্বিক উন্নতির চেষ্টা করতেন। এমনকি তাঁরা মোঙ্গল আক্রমণের সময়ও নিরীহ জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখতেন। এই তরীকার আরেক জন সুফি দরবেশ শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজি সুলতান ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে বাংলায় এসেছিলেন এবং এখানে ইসলাম বিস্তারে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন।

ভারতে চিশতিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ মঈনউদ্দিন চিশতি। তিনি ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আসেন। লাহোরে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি আজমীরে চলে

যান এবং সেখানেই ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন ভারতের সুফি দরবেশদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি 'সুলতান-উল-হিন্দ' বা হিন্দুস্তানের আধ্যাত্মিক সুলতান রূপে পরিচিত।

দিল্লি সালতানাতের প্রাথমিক যুগের সুফি দরবেশদের মধ্যে খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী, নজমউদ্দিন (সুঘরা), কাজি হামিদউদ্দিন নাগোরী, বাবা ফরিদ প্রমুখ ছিলেন বিখ্যাত। তাঁরা এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন।এই সব সুফিদের ইসলামের বাণী প্রচারের ফলে ও তাঁদের সহজ-সরল জীবনযাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

সারসংক্ষেপ

ভারতে মুসলিম আগমনের তৃতীয় পর্যায়ের নায়ক ছিলেন গজনীর শাসনকর্তা মুহাম্মদ ঘোরী এবং এই অভিযানের ফলে ভারতে মুসলমানদের দীর্ঘস্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মূলত, মুহাম্মদ ঘোরীর এশিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতাই ভারত অভিযানে তাঁকে আগ্রহী করে তোলে। এ সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের অনৈক্য ও অন্তর্বিবাদ। ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে তাঁর প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন। অত:পর ১১৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কয়েকবার অভিযান চালিয়ে তিনি মুলতান, উচ দুর্গ, পেশোয়ার, লাহোর, পাঞ্জাব, সরহিন্দ অধিকার করেন। কিন্তু রাজপুতরা তাঁর অগ্রগতি রোধ করে। আজমীর ও দিল্লির চৌহান রাজা পৃথ্বিরাজের নেতৃত্বে উত্তর ভারতীয় হিন্দু রাজাদের সম্মিলিত জোটের বিরুদ্ধে ১১৯১ সালের তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রান্তরে পুনরায় উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘোরী জয়লাভ করেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। ভারতে দীর্ঘস্থায়ী মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক হিসেবে তিনি ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মুহাম্মদ ঘোরী ছিলেন–
   (ক) গিয়াসউদ্দিন ঘোরীর ভ্রাতা (খ) ইলতুৎমিশের পিতা
   (গ) সুলতান মাহমুদের পুত্র (ঘ) গিয়াসউদ্দিন বলবনের পৌত্র

২. মুহাম্মদ ঘোরী ছিলেন–
   (ক) ইরানি (খ) মোঙ্গল
   (গ) তুর্কি (ঘ) সেলজুক

৩. তরাইনের ১ম যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন–
   (ক) খসরু মালিক (খ) জয়চন্দ্র
   (গ) পৃথ্বিরাজ (ঘ) রাণা প্রতাপ

৪. তরাইনের ২য় যুদ্ধ হয়েছিল–
   (ক) ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে
   (গ) ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে

৫. মুহাম্মদ ঘোরী মারা যান–
   (ক) ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে
   (গ) ১২১০ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। মুহাম্মদ ঘোরী সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

২। রাজপুতদের সাথেমুহাম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষের বিবরণ দিন।
৩। ভারত আক্রমণকারী হিসেবে সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘোরীর তুলনামূলক পর্যালোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের কারণ উল্লেখপূর্বক ভারত বিজয়ের বিবরণ দিন।
২। ভারত বিজয়ে মুহাম্মদ ঘোরীর সাফল্যের কারণ আলোচনা করুন।
৩। মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত জয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India.*
২। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*
৩। আবদুলকরিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন।*
৪। আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস।*

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ : ১ ১। (গ) ; ২। (খ) ; ৩। (ক) ; ৪। (ঘ) ; ৫। (ঘ)।
পাঠ : ২ ১। (খ) ; ২। (খ) ; ৩। (ঘ) ; ৪। (ক) ; ৫। (গ)।
পাঠ : ৩ ১। (ক) ; ২। (গ) ; ৩। (গ) ; ৪। (খ) ; ৫। (খ)।